দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

নির্মাণশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজার দিনই
এদেশের প্রকৃত শ্রমিক দিবস
— পৃঃ ১৩

বঙ্গ রাজনীতিতে তৃণমূল-বাম
জোট কি সময়ের অপেক্ষা ?
— পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।। ৩০ ভাদ্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ৩০ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৬ সেপ্টেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

হাজারির সরকার আর নেই দরকার, জনতার রোষ এখন জনরোষ :

নিভছে মমতার ঝাড়বাতি ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

অনেক হলো কান্নাকাটি মিছিল, দিদির ডাকে ঠাকুর দেখতে চলুন ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

হিমন্ত, মুসলমান সম্প্রদায় এবং উদারবাদী বিভ্রান্তি

◻ দেবদত্ত পট্টনায়েক ◻ ৮

চীনের ভারতীয় ভূখণ্ড দখল : সংবাদ-পরিবেশনে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

বঙ্গ রাজনীতিতে তৃণমূল-বাম জোট কি সময়ের অপেক্ষা ?

◻ চাণক্য পণ্ডিত ◻ ১১

নির্মাণ শিল্পী বিশ্বকর্মা পূজার দিনই এদেশের প্রকৃত শ্রমিক দিবস

◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১৩

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-কারখানার অন্তর্জলি : বামেদের ভূমিকা

◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ১৫

বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিই ভারতীয় শ্রমিক দিবস হিসেবে উপযুক্ত

◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ১৯

বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্মা ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ২৩

দশলক্ষণ পর্ব : এক স্বল্প পরিচিত ভারতীয় উৎসব

◻ সুখময় মাজী ◻ ৩১

ভারতের প্রসিদ্ধ বিশ্বকর্মা মন্দিরসমূহ এবং জাতীয় শ্রম দিবসের ভাবনা ◻ সৈকত চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৪

গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক বাড়ি ◻ ৩৫

স্বামীজীর বিশ্বজয়ের নেপথ্য এবং তৎকালীন কলকাতার প্রতিক্রিয়া

◻ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ◻ ৪৩

শিবরামের আত্মজীবনীই আসলে শিব্রামের জীবনী

◻ স্বপন কুমার মণ্ডল ◻ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০** ◻ **খেলা : ৩৮** ◻ **অন্যরকম : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯**

প্রকাশিত হবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

বঙ্গের নবজাগরণ : হিন্দু নবজাগরণ

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গের নবজাগরণ উল্লেখযোগ্যভাবে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক আন্দোলন ছিল। রামমোহন রায় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই ধারা প্রবহমান। স্বাভাবিকভাবেই এই আন্দোলন হিন্দুত্বভিত্তিক ছিল, যাকে হিন্দু নবজাগরণ বলা যায়।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবেন রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজদীপ মিশ্র, ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি, অনীশ দাশ, কল্যাণ গৌতম প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতীয় শ্রমদিবস

ভারতীয় শাস্ত্র, পুরাণ, এমনকী বেদে বিশ্বকর্মাকে নির্মাণশিল্পী বলা হইয়াছে। সমস্ত প্রকারের নির্মাণ শিল্পের তিনি প্রকাশক। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে তাঁহাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ স্থপতি বলা হইয়াছে। তিনি ভারতীয় দেবদেবীর হস্তে শোভিত বিভিন্ন সমরাস্ত্রেরও নির্মাতা। ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, মহাদেব শিবের ত্রিশূলের তিনিই নির্মাতা। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীও তিনি নির্মাণ করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রের দারুব্রহ্মের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তিনিই নির্মাণ করিয়াছেন। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের ধাতুশিল্প, দারুশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, মৃৎশিল্পে নিযুক্ত মানুষ নিজ নিজ কর্মে দক্ষতা অর্জনের নিমিত্ত বিশ্বকর্মার পূজা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া থাকেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে শ্মশ্রু-গুম্ফ শোভিত, প্রাজ্ঞ শিল্পীরূপে বিশ্বকর্মা পূজিত হন। বঙ্গপ্রদেশে কেবল সরু গুম্ফ শোভিত নবীন শিল্পীরূপে পূজিত। তাঁহার চারি হস্তে হাতুড়ি, তির-ধনুক ও তুলাদণ্ড রহিয়াছে। হস্তী তাঁহার বাহন। ঘটে-পটে-মূর্তিতে বিভিন্নভাবে তাঁহার পূজা করা হইয়া থাকে। যে কোনো নির্মাণশিল্পে যুক্ত শিল্পী অথবা শ্রমিক ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি তিথিতে ভক্তিভরে বিশ্বকর্মার পূজা করিয়া থাকেন। পূজার দিন শিল্পী অথবা শ্রমিকরা নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নির্মাণ সামগ্রী তথা কলকারখানার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া কর্মস্থলের পরিবেশকে সুন্দর করিয়া তোলেন। উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, পূজার দিন শ্রমিকরা অলিখিত ছুটি উপভোগ করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকিয়া, যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করিয়া, দেবশিল্পীর স্তব করিয়া অবশেষে পূজায় ব্রতী হন। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। তাই বিশ্বকর্মার পূজার দিনটিই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শ্রমদিবস। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোত এই দিনটিকে সর্বশ্রেণীর শিল্পী অথবা যে কোনো সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকরা একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছে।

দুঃখের বিষয় হইল, বিদেশি মতাদর্শে বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি দিনকে শ্রমিক দিবস হিসাবে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারাই ভারতে দিনটির আমদানি করিয়াছে। যাহারা জঙ্গি আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকারখানার অন্তর্জলি যাত্রা ঘটাইয়াছে, তাহারাই শ্রমিকবন্ধু সাজিয়াছে। একদা এই পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটি হইতে বজবজ পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীরবর্তী এলাকা শিল্প কারখানায় সমৃদ্ধ ছিল। আর্থিক দৃষ্টিতে তখন এই রাজ্য প্রথম স্থানে অবস্থান করিত। বিদেশি শক্তির অঙ্গুলিহেলনে মালিক বিরোধী জঙ্গি আন্দোলনে শিল্পকারখানায় তাহারা লালঝান্ডার দাপটে লালবাতি জ্বালাইয়াছে। যে শিল্পকারখানাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বাহিরের রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল, তাহা ধ্বংস করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ইহাদেরই কল্যাণে। তাই শ্রমিকদের মঙ্গলের কথা বলিবার তাহাদের কোনো অধিকার নাই। শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের স্বার্থেই তাহারা শ্রমিকদরদি সাজিয়া থাকেন। বিশ্বের সব দেশেই নিজ নিজ শ্রমদিবস রহিয়াছে। আমেরিকা, কানাডা এই বিশেষ দিনটিকে গ্রহণ করে নাই। তাহারা মনে করে, দিনটি রক্তপাত ও হানাহানির দিন। তাহা কোনোমতেই জাতীয় শ্রমদিবস হইতে পারে না। তাই ওই দুইটি দেশ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার তাহাদের শ্রমদিবস হিসাবে পালন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন। প্রথমাবধি তাহারা বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিকেই ভারতীয় শ্রমদিবস রূপে পালন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের স্লোগান হইল, দেশের হিতার্থে শ্রমিকরা কাজ করিবে, তাহার বিনিময়ে তাহারা ন্যায্য পারিশ্রমিক লইবে এবং দেশকে তাহারা সমৃদ্ধ করিবে। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সম্পৃক্ত এই ভাবনায় দেশের শ্রমিকরা ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের ছত্রতলে সংগঠিত হইতেছে। তাহারা বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিকেই জাতীয় শ্রমদিবস রূপে মানিয়া লইয়াছে। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভগবান বিশ্বকর্মাই যে কোনো নির্মাণশিল্পীর আরাধ্য দেবতা।

সুভাষিতম্

তেজস্বিনী ক্ষমোপেতে নাতিকার্কশ্যমাচরেৎ।
অতিনির্মথনাদ্ বহ্নিঃ চন্দনাদপি জায়তে।।

তেজস্বী ও ক্ষমাশীল ব্যক্তির প্রতি অতি কঠোর আচরণ করা উচিত নয়। অতি ঘর্ষণে চন্দন কাঠ থেকেও অগ্নি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

হাজারির সরকার আর নেই দরকার, জনতার রোষ এখন জনরোষ

নিভছে মমতার ঝাড়বাতি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

চিকিৎসক আর নাগরিক সমাজ বনাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যসন্ধানী বনাম লুটেরা। পশ্চিমবঙ্গকে আড়াআড়ি ভাগ করেছেন তিনি। একটি নৃশংস হত্যাকে ধামাচাপা দিয়ে স্বজনপোষণ চালাতে। দাবি 'হাজার টাকার সরকার আর নেই দরকার'। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের টাকা বিলিয়ে ভোট কেনেন। আরজি কর কাণ্ডে মমতার ভূমিকা অতীব ন্যক্কারজনক। অপরাধীরাও তা স্বীকার করবে। চোররানির পর মমতার নাম হয়েছে লোপাটরানি। কাজ হলো তথ্য লোপাট করে অভয়ার হত্যা আর অত্যাচার ধামাচাপা দেওয়া। শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালের দাগি অধ্যক্ষের চিঠি ফাঁস হয়েছে। রাজ্যের পুলিশি তদন্তে একরাশ অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। ঘটনা চাপতে বিভিন্ন ছল আর চাতুরি ধরা পড়েছে। ময়না তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিজের দোষ চাপার অভ্যাস সব শাসকেরই থাকে। মমতার ক্ষেত্রে মাত্রাটা অনেক বেশি। প্রায় ক্যানসারের মতো।

আরজি কর ঘিরে তাঁর কুকীর্তি নজির হয়ে থাকবে। হাসপাতালে অপকর্মের স্থানটি সংস্কারের নামে ধ্বংস করে ফেলতে স্বাস্থ্যসচিব এনএস নিগম দাগি অধ্যক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আগেই লিখেছিলাম স্বাস্থ্যসচিব সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। তাকে জেরা করা উচিত। অনেকদিন থেকেই তার এক শাগরেদ সরকারি হাসপাতালের বেআইনি কাজে লিপ্ত থেকে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলির নজরে পড়ে। শাগরেদ আমলাটি অন্য দপ্তরে রয়েছে। পূর্ববর্তী রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় এক নেতাকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। ধনকড় বলেছিলেন কয়লা, গোরু, বালির চোরাকারবার আর পাচারের থেকে বহুগুণ বেশি বেআইনি কাজ হয় স্বাস্থ্য বিভাগ আর সরকারি হাসপাতালে। এক চিত্র পরিচালক সঠিক বলেছেন, রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালেই সন্দীপ ঘোষের মতো দাগি অপরাধী রয়েছে।

মমতা সব জেনেও কেন চুপ ছিলেন তার উত্তর মমতাই দিতে পারবেন। অথচ প্রথম ক্ষমতায় এসে সরকারি হাসপাতালকে দুর্নীতিমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। সিবিআই নিগমকে জেরা করলেই সব ফাঁস হবে। মমতাও রেহাই পাবেন না। মমতা জমানার সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায় আরজি কর কাণ্ড। কন্যা অভয়ার আত্মা বহ্নিমান। তাই বিচারের দাবিতে মমতার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে নাগরিক আন্দোলন। তৃণমূলের দুই সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় আর জহর সরকার মানুষের সনদ হাতে নিয়ে মমতার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। নতমস্তক নন বলে হয়তো পুরোনো আমলা জহর পদত্যাগ করেছেন। আর আইনজীবী সুখেন্দু দল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার প্রহর গুনছেন।

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তার আগেই সিবিআই তার দ্বিতীয় রিপোর্ট সর্বোচ্চ আদালতে জমা দেবে। মমতা নাটকের শেষের শুরু হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর মমতা বৈঠক ডেকেছিলেন। অনেকের ধারণা মমতা নাটক করে সরে দাঁড়াতে পারেন আর হয়তো বৃদ্ধ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বা ফিরহাদ হাকিমকে দায়িত্ব দেবেন। নয়তো সবাই মিলে গোটা আরজি কর কাণ্ড ধামাচাপা দিতে পথে নামবেন। মমতা জানেন প্রতিদিন জনতার রোষ কীভাবে জনরোষে পরিণত হচ্ছে। গত ১৪ আগস্টের রাজ্যের নারীশক্তির রাত দখল মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারের থেকে অনেকগুণ শক্তিশালী। এই জনশক্তিকে আয়ত্তে এনে তার থেকে ফয়দা তোলা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে অসম্ভব। মমতা চোরা রাস্তার রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন।

সামাজিক আন্দোলনের রোষ প্রত্যক্ষ করেননি মমতা। নিজেও কোনো সামাজিক আন্দোলন করেননি। জনতার রোষ প্রতিদিন বাড়ছে। তার ক্ষয় নেই। পূজার চারদিনের মেজাজে তা ঢাকা পড়বে না। সে আঁচে রাজনৈতিক রুটি সেঁকা যায় না। পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মমতার বিরুদ্ধে আর কন্যা অভয়ার বিচার চেয়ে দু'টি ধারার আন্দোলন চলছে। দু'য়ের সম্মিলিত উদ্যোগে মমতার মিথ্যার বেসাতি আর রাজনৈতিক ভিত নড়তে বাধ্য। অভয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু চাপা দিতে মমতা যে ভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করে মিথ্যার জাল বুনেছে তাতে স্থানীয় দুষ্কৃতীরাও লজ্জা পাবে। তাকে মুখ্যমন্ত্রী ভাবতে লজ্জা লাগছে। মমতা মানুষের শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। গায়ের জোর বা গলার জোরে তা আদায় হয় না। অজ্ঞান মমতা কারও জ্ঞান গ্রহণ করে না। তাই তাঁর সরে দাঁড়ানোই ভালো। মানুষ বেছে নেবেন কীসে মঙ্গল। কীসে সঠিক বিচার। কে হবে তার বদলি।

> **মমতার বিরুদ্ধে আর কন্যা অভয়ার বিচার চেয়ে দু'টি ধারার আন্দোলন চলছে। দু'য়ের সম্মিলিত উদ্যোগে মমতার মিথ্যার বেসাতি আর রাজনৈতিক ভিত নড়তে বাধ্য।**

অনেক হলো কান্নাকাটি মিছিল দিদির ডাকে ঠাকুর দেখতে চলুন

উৎসবপ্রিয়াষু দিদি,

আপনি উৎসব ভালোবাসেন আমি জানি। মহালয়ার আগেই উদ্বোধনে নেমে পড়েন। সেও যে আসলে রাজনীতির জনসংযোগ তা আমি জানি। কিন্তু এবার সেটা করতে পারবেন কি? সাবধান দিদি। রাস্তাঘাটে, প্যান্ডেলে আপনার কাছে কিন্তু সবাই বিচার চাইবে। তবু আপনি বলছেন, অনেক হলো কান্নাকাটি মিছিল, এবার সবাই ঠাকুর দেখতে চলো!

আমার চেয়ে আপনি সেটা অবশ্য ভালো জানেন। তাই তো, আপনি বলছেন, 'এক মাস তো হয়ে গেল। আমি অনুরোধ করব, পূজাতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন।' আমার প্রশ্ন, আপনি নিজেকে কী মনে করেন? গোটা রাজ্যের মানুষ কি আপনার দলের চাকরবাকর নাকি! আপনি ঠিক করে দেবেন মানুষ কখন আন্দোলন শেষ করবে? আজ কিন্তু দিদি, গোটা পশ্চিমবঙ্গ ভারাক্রান্ত। জীবনে কখনোও যে মা মিছিলে হাঁটেননি তিনিও পথে। নির্যাতিতাকে সকলে কন্যা, মা, সহোদরা মনে করে আন্দোলনে। আপনার উচিত ছিল সমব্যথী হয়ে রাজ্যের মানুষকে সমবেদনা জানানোর। কিন্তু সেটা না করে আপনি মানুষকে পূজার আনন্দে মাততে বলছেন! এটা কিন্তু আমিও মানতে পারিনি। আপনার অনেক ভাইও পারেনি দিদি।

রাজ্যের দেওয়া টাকা নেবে না বলে জানিয়েছে এমন পূজা কমিটিকে তাদের গুরুত্ব না দেওয়ার বার্তাও আপনি দিয়েছেন। কিন্তু দিদি, আপনি এটা মনে রাখবেন, আপনার দান খয়রাতি যদি একটি ক্লাবও বয়কট করে তবে বুঝতে হবে আপনার হার সেটা। আপনি যে আর পয়সা দিয়ে বিবেক কিনতে পারবেন না সেই বার্তা আপনি পেয়ে গিয়েছেন। স্রোতের অনুকূলে অনেকের সাঁতার কাটার থেকে একটা প্রতিবাদের সামাজিক মূল্য অনেক বেশি। মনে রাখবেন দিদি, এবারে যা অবস্থা তাতে মানুষ পূজাও করবে, মিছিলও করবে। মায়ের কাছে আপনার বিনাশও চাইতে পারেন। তাই সাবধান, কে কী করবে সেটা না ভেবে আপনি উৎসব থেকে দূরে থাকুন। এমনিতেই লোকে ছি ছি করছে, তার উপরে মানুষের ঘাড়ে উৎসব চাপিয়ে দিতে চাইলে কেউ বড়ো বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে না। মনে রাখবেন, পূজা আর উৎসব এক নয়।

দিদি, আপনি কি সত্যিই নারীর সুরক্ষা চান? তবে কেন্দ্রের পাঠানো টাকা খরচেও আপনার এত অনীহা কেন? ২০১২ সালে দিল্লিতে নির্ভয়াকাণ্ডের পরে কেন্দ্রের তরফে এই নির্ভয়া তহবিল গঠিত হয়। মূলত মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য যে যে কর্মসূচি জরুরি তার জন্যই ওই তহবিল তৈরি হয়। এরপর থেকে ফি বছরই ওই তহবিল বাবদ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সাধারণ বাজেটে। তাতে অন্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও টাকা পেয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যওয়াড়ি যে হিসেব ২০১৯ সালে সংসদে জমা দিয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পর্যন্ত এই রাজ্যের জন্য কেন্দ্র বরাদ্দ করে ৭৫.৭০৮ কোটি টাকা। আর রাজ্যের তরফে কেন্দ্রকে পাঠানো খরচের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার মতো। বাকি টাকা কোথায় গেল দিদি?

> **দেশের মধ্যে নির্ভয়া তহবিলের টাকা খরচের নিরিখে পিছনের সারিতেই পশ্চিমবঙ্গ। একই সঙ্গে সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষায় নির্ভয়া তহবিলের ব্যবহার নিয়ে সরকারি অনীহা প্রবল। কেন্দ্রের পাঠানো টাকা খরচের পরিমাণ মাত্র ৫ শতাংশ।**

এর পাশাপাশি ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের মোট আটটি শহরের নিরাপত্তা বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'সেফ সিটি' তৈরির তালিকায় আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, হায়দরাবাদ, লখনউ, মুম্বইয়ের সঙ্গে থাকে কলকাতাও। প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। কলকাতা-সহ সব শহরের জন্য এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র এই খাতে ১,৪০৮.৩৩ কোটি টাকা পাঠিয়েছে। কলকাতাকে 'সেফ সিটি' বানাতে মোট ১৮১.৩২ কোটি টাকার প্রকল্প তৈরি করে কেন্দ্র। এর মধ্যে কেন্দ্রের ১০৮.৭৯ কোটি টাকা। বাকিটা রাজ্যের খরচ। কিন্তু কেন্দ্রের টাকা কোথায় খরচ হলো হিসেব দেবেন কি দিদি? আরও একটা কথা মনে করিয়ে দিই। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি লোকসভায় জানান, 'সেন্ট্রাল ভিকটিম কমপেনসেশন স্কিম' (সিভিসিএফ) নামে প্রকল্পে ২০১৬-'১৭ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ পায় ১২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। খরচ করতে পেরেছে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা।

কোন রাজ্যে নির্ভয়া তহবিল কেমন খরচ হচ্ছে তা নিয়ে একটি বেসরকারি সংস্থা ২০১৯ সালে সমীক্ষা চালায়। 'কল্যাণ সত্যার্থী চিলড্রেন্স ফাউন্ডেশন'-এর সেই সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে। তাতে দাবি করা হয়েছে, দেশের মধ্যে নির্ভয়া তহবিলের টাকা খরচের নিরিখে পিছনের সারিতেই পশ্চিমবঙ্গ। একই সঙ্গে ওই সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষায় নির্ভয়া তহবিলের ব্যবহার নিয়ে সরকারি অনীহা প্রবল। কেন্দ্রের পাঠানো টাকা খরচের পরিমাণ মাত্র ৫ শতাংশ।

অতিথি কলম

দেবদত্ত পট্টনায়েক

হিমন্ত, মুসলমান সম্প্রদায় এবং উদারতাবাদী বিভ্রান্তি

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সম্প্রতি বলেছেন যে তিনি তাঁর রাজ্য 'মিঞা' মুসলমানদের দখল করতে দেবেন না। ভারতে অনুপ্রবেশ করে অসমে ঘাঁটি গাড়া বাংলাদেশি মুসলমানরা সেই রাজ্যে মিঞা নামে পরিচিত। কোনো পরিস্থিতিতেই তাদের হাতে অসমকে তুলে দেবেন না বলে জানিয়েছেন হিমন্ত। এরই মাঝে কট্টরপন্থী ইসলামের প্রচার-প্রসার রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান। লম্বা দাড়ি, হিজাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই দেশগুলির তরফে প্রেরিত বার্তাটি খুব স্পষ্ট। দেশীয় সংস্কৃতি থেকে মজহবকে আলাদা করতে এই মুহূর্তে সেই দেশগুলির প্রশাসন বিশেষ তৎপর। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি হতে আগত মুসলমানদের ক্ষেত্রে অভিবাসন নীতি কঠোর করেছে হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড। এমনকী দেশ থেকে এই অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের ক্ষেত্রেও তারা সক্রিয় হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের নানা প্রান্তের এই ঘটনাপ্রবাহ 'অভিবাসন' ও 'বহুত্ববাদ'-এর ইস্যুকে ফের যেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

সমতা বা সাম্যের চিন্তার সঙ্গে ইনক্লুশন বা আত্তীকরণের ধারণাকে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা সম্প্রতি বেড়ে চলেছে। প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। কিন্তু সব কিছুকে সে স্থান দেয় না। বিশ্ব প্রকৃতির চরিত্রের সঙ্গে সমতার নীতির কোনোরকম সাযুজ্যও নেই। প্রতিটি উদ্ভিদ প্রজাতিও প্রকৃতির বুকে প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার লড়াই চালায়। আক্রমণকারী জীব, প্রাকৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরজীবীদের পরাস্ত করে এই উদ্ভিদেরাও বেঁচে থাকার এই নৈমিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রতিনিয়ত শামিল থাকে। আত্তীকরণের নীতি গ্রহণ করে সবাইকে সব সামাজিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে মানুষ। কিন্তু একমাত্র পরিণত-মস্তিষ্ক ও উন্নত-চেতনা সম্পন্ন মানুষের পক্ষেই এই কাজ সম্ভব। পরিণত বুদ্ধি ও ধ্যানধারণা অর্জনের প্রক্রিয়াও একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। অধিকাংশ মানুষ চায় গড্ডলিকা প্রবাহে শামিল হতে, যেদিকে পাল্লা ভারী সেদিকে যোগ দিতে, যে দল শক্তিশালী তার অংশ হতে, যেদিকে মধুভাণ্ড সেইদিকে ঝুঁকতে। যাদের দেখে সাধারণ মানুষ একটু নিরাপদ বোধ করে, সম্ভাব্য বিপদের আঁচ এড়াতে তাদের মধ্যেও একই মনোভাব ও প্রবণতা দেখা যায়।

'আত্তীকরণ'-এর এই তথাকথিত আদর্শ আজ যেন একটি মহান বিচারধারায় পর্যবসিত হয়েছে। কেউ এর বিরোধিতা করলেই তাকে 'ফ্যাসিস্ট' বলে দাগিয়ে দেওয়া চলছে। পশ্চিমি বিশ্বের, বিশেষত ইওরোপ-আমেরিকার শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি হতে এই সর্বগ্রাসী ধারণাটি উদ্ভূত। এই ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারার কবলে আজ গোটা বিশ্ব। সবাই একই পথের পথিক হবে, এক চিন্তাভাবনা করবে— এই বিষয়টিই এই বিচারধারার কাছে একমাত্র কাম্য। সকলে তাদের সুরে সুর মেলাবে, তাদের ভাবনাকেই নিঃশর্তে সমর্থন করবে— এটিই হলো এই ধ্বংসাত্মক বিচারধারার মূল উপজীব্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জারি ছিল সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করার একই প্রবণতা। সেই সময় কোনো মানুষের পরিচয় ছিল হয় ক্যাপিটালিস্ট (পুঁজিবাদী), নয়তো কমিউনিস্ট। তার আগে লোকজন গির্জাগামী না হলে তাদের প্যাগান বা পৌত্তলিকতার অনুসারী হিসেবে ধরে নেওয়া হতো। কেবলমাত্র একটি সত্য, একটি মাত্র পুস্তক এবং একমুখী মতের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে পশ্চিমি বিশ্ব, যেগুলিকে 'সর্বজনীন' বলে তুলে ধরে তাদের তরফে লাগাতার প্রচার চলে। তাদের এই উপদ্রব বিশ্বের বাকি অংশের অশেষ জ্বালাযন্ত্রণার কারণ।

চীনের উদাহরণ এক্ষেত্রে আলোচনা করা যেতে পারে। চীন চিরকাল 'আইসোলেশনিজম্'-এর অনুসারী। অর্থাৎ, বহির্বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন থাকার পক্ষপাতী। একদা বিদেশি আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ রুখতে চীনে বিশাল প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। সেই প্রাচীরের অন্তরালে প্রাচীনকালে বিকশিত হয় চৈনিক সভ্যতা। আধুনিক বিশ্বের ছোঁয়াচ এড়াতে আজ তাদের হাতে রয়েছে— 'ফায়ার ওয়াল' (এক ধরনের প্রযুক্তি)।

ভারতের অনুসৃত প্রক্রিয়াটি যদিও ভিন্নধর্মী। সেখানে কোনো দেওয়ালের অস্তিত্ব ছিল না, একটি মাত্র বইয়ের রাজত্বও এখানে কোনো কালে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব যতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ভারতবর্ষের সীমারেখা। সেই সীমানার পাশাপাশি সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, ভারতীয় দেব-দেবী, আধ্যাত্মিক ভাবনা ও চেতনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ একদা তাঁর সমগ্র রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিভিন্ন নিকায়, মহাযান পরম্পরার অন্তর্গত নানা সম্প্রদায় এবং একাধিক তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত ও পথের স্বাধীন, সহাবস্থানধর্মী অস্তিত্ব ছিল এই ভারতবর্ষে। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদরা ইতিহাস ঘেঁটে একজন মাত্র বুদ্ধের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন। তাই তারা প্রচার করলেন একজন মাত্র বুদ্ধের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের ধারণা। জৈন মত ও ভাবধারায় আস্থাশীল ৩০টিরও বেশি সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ভারতে দেখা যায়। তারা কেউই নিজেদের মধ্যে কোনো লড়াই চালায় না বা একে অপরকে হত্যা করে না। ভারতে অবস্থানকারী একই মতের একাধিক সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের এই চিত্রের বিপ্রতীপে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। বিগত বহু শতাব্দী ধরে খ্রিস্টান (ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট) এবং মুসলমানদের

(শিয়া-সুন্নি) ক্ষেত্রে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের যে আচরণ দেখা যায় তা এক কথায়— ভয়াবহ। পশ্চিমি দুনিয়ার 'সমজাতীয়করণ'-এর পদ্ধতির পরিবর্তে ভিন্ন চিন্তাধারায় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং ভিন্ন মত ও পরম্পরার মানুষদের সঙ্গে সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে 'ভারতীয় আত্তীকরণ'-এর প্রক্রিয়া।

বহু কাল ধরেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নানা মত-পথের উদ্ভব এবং অসংখ্য পরম্পরার উন্মেষ ঘটেছে। হিন্দু ধর্মাচরণকারীদের মধ্যে বিরাজমান 'হিন্দুত্ব'ই হলো রাষ্ট্রবোধের মূল বিষয়বস্তু। এই রাষ্ট্রচেতনার দ্বারাই সাধিত হয়েছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ভাষাগত প্রভেদ এবং ভৌগোলিক কারণে অসমীয় ও গুজরাটিদের স্বকীয় সত্তা থাকলেও হিন্দুত্বের কারণে সাধিত হয়েছে সংস্কৃতিগত ঐক্য, রাষ্ট্রবোধের জাগরণে সম্পন্ন হয়েছে পারস্পরিক মেলবন্ধন। ভারতীয় চিন্তানায়করা, সমাজ সংস্কারকরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। জমিদার, লেখক, হিসাবরক্ষক, যোদ্ধা, তাঁতি, মুচি, মাংস বিক্রেতা কসাই, মহাজনী কারবারে যুক্ত ব্যক্তিরা ভারতীয় সমাজে নানা সময় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ব্যবসা বাণিজ্য, মেলা-সহ বার্ষিক নানা পালাপার্বণ এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সর্বদা সংযুক্ত থাকতেন বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের হিন্দুরা। তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী, রাজা ও সন্ন্যাসীদের এক মহান মিলনক্ষেত্র এবং পারস্পরিক মত বিনিময় কেন্দ্র ছিল সেদিনের সেই ভারতবর্ষ। ভূপ্রকৃতিগত বৈচিত্র্যকে জয়ের দ্বারা বিভিন্ন ভূখণ্ডকে একত্রিত করে, সমস্ত ভৌগোলিক দূরত্ব ও সীমারেখাকে অতিক্রমের মাধ্যমে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে একতাধর্মী, গঠনমূলক মতাদর্শের জন্ম দিয়ে গিয়েছে প্রাচীন সেই ইতিহাস।

সাধারণত বিভিন্ন সম্রাট ও মহারাজাদের আনুকূল্যেই ব্রাহ্মণকুলের জীবন অতিবাহিত হতো। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক দেব-দেবীদের রূপকল্পনা, তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং তাঁদের পূজার্চনা বিধি রচনার সঙ্গে পৌরোহিত্যের কাজের মাধ্যমে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। ভারতীয় দেবতাদের মধ্যে হর (ভগবান শিব) ও হরি (ভগবান শ্রীবিষ্ণু) উভয়ই যেমন পূজিত হতেন, তেমনই নিরাকার পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মের উপাসনার প্রচলনও আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষে দেখা যায়। ভারতীয় ভাবনাচিন্তায় সৃষ্টি হয়েছে সব উপাস্যদের সমবায়ে দিব্যলোক বা এক অখণ্ড ঐশ্বরিক মহাজগৎ। 'বর্ণাশ্রম' নামক সামাজিক কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে এই ভারতের বুকে। ধর্মানুষ্ঠান, আচার, সংস্কার, দেশ শাসন - প্রতিরক্ষা, কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্য- অর্থনীতি এবং শ্রম ও পরিষেবা ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে যুক্ত ছিল বর্ণাশ্রম অনুযায়ী চারটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত সমগ্র ভারতীয় সমাজ।

সমাজের উচ্চ স্তর থেকে নিম্নাভিমুখে সামাজিক ক্ষমতায়নের স্রোত প্রবাহিত হবে— এটিই ছিল প্রচলিত ভারতীয় ধারণা। ইসলামিক আক্রমণের পর ভারতে মুসলমানদের প্রবেশ ঘটলে এবং প্রচুর ভারতীয় তাদের হাতে ধর্মান্তরিত হতে থাকলে ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয় আরও একটি সম্প্রদায়। একজন মুসলমান তাঁতি বা জোলা মুসলমান শাসকের সঙ্গে মজহবি মত অনুযায়ী এক হলেও, জাতিগত প্রভেদ ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসগত ভিত্তিতে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। মুঘল আমলে বাদশাদের তরফে রাজপুত রাজকন্যাদের বলপূর্বক নিকাহ্ করার প্রবণতা দেখা যায়। রাজপুত কন্যারা মুঘল বাদশাদের সম্পত্তিতে পরিণত হলেও রাজপুত রাজবংশগুলি 'হিন্দু' রয়ে যায়। তুর্কি আমলে মুসলমান সুলতানদের সঙ্গে জৈন মতাবলম্বী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক লেন-দেনের ইতিহাস পাওয়া যায়। পেশাগত স্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও লেনদেন অব্যাহত থাকলেও গৃহস্থালী ছিল এই সম্পর্কের ছোঁয়াচমুক্ত। বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপার ছিল না, হেঁশেল ভাগাভাগির তো প্রশ্নই নেই। রোটি-বেটির মধ্যে সূক্ষ্ম বিভাজনধর্মী জটিল সম্পর্কের (অর্থাৎ, জীবিকা ও অর্থনীতির সঙ্গে বাড়ির মা-বোন-স্ত্রী-কন্যার সম্পর্ক-রহিত একটি ব্যবস্থা) এই অসম সমীকরণ ইসলামি শাসনে ভারত জুড়ে জাতিব্যবস্থার এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটায়। পশ্চিমি দুনিয়ায় প্রশাসন ও চার্চের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা অঙ্কনের বহু আগে সামাজিক পৃথকীভবনের এই ব্যবস্থা ভারতে অলিখিতভাবে বলবৎ ছিল।

পার্সি সম্প্রদায়ের মানুষ এই দেশে আশ্রয়ের খোঁজে এলে একজন দেশীয় হিন্দু রাজা জাতিগত সংমিশ্রণের আশঙ্কা করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলে পবিত্রতা নষ্ট হয়ে সমাজ কলুষিত হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। যদিও এই সমস্যা নিরসনে তাঁদের হাতে এক পাত্র দুধ তুলে দিয়ে তিনি জানান যে পার্সিদের থাকতে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা তাঁর রাজ্যে নেই। শোনা যায় পার্সিরা সেই দুধে কিছুটা চিনি মিশিয়ে দিয়ে রাজাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাঁরা এই দুধের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যেই কাজ করে যাবে, দুধটিকে বিষাক্ত করে তোলার লক্ষ্যে নয়। ভারতে আশ্রয়লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁদের ঐতিহাসিক অবদান এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা বিচার করে বলা যায় যে লেবুর রস মিশিয়ে দুধকে তারা ছানায় পরিণত করেনি।

বহুত্ববাদী বৈচিত্র্য এবং আত্তীকরণের চিরাচরিত প্রক্রিয়াকে 'সমতা' বা 'সাম্যবাদ'-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা বর্তমান বিশ্বে ক্রমবর্ধমান। পরস্পরবিরোধী অবস্থানে থাকা বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। একে অন্যের পরিপূরক হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তারা প্রতিযোগিতা ও দ্বিপাক্ষিক লড়াইতে লিপ্ত থাকে। বিভিন্ন দেশে একটু কম বেতনের বিনিময়ে কায়িক পরিশ্রমসাধ্য সব রকম কাজ করতে পারবে এমন লোকের অভাব দেখা দেওয়ার কারণেই অনুপ্রবেশকারীদের রমরমা দেখা যায়। কম পারিশ্রমিকে কাজ করার মাধ্যমে কার্যত কর্মক্ষেত্রগুলির দখল নিয়েছে এই অনুপ্রবেশকারীরা। সমস্যার সূত্রপাত ঘটে যখন সেই দেশগুলিতে জন্ম নেওয়া এদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই দেশের মূল বাসিন্দাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে বা সমান সামাজিক মর্যাদা লাভের অধিকার জাহির করে। নতুন লোকজনকে সমাজের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াটি হিন্দুদের করতলগত। প্রাচীনতম সভ্যতার মানুষজন এই ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আরোপিত নীতি কখনও স্মরণাতীত কাল ধরে প্রচলিত সামাজিক সংস্কারকে পরিবর্তিত বা প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। জ্ঞানের দিব্যজ্যোতি একমাত্র বিভ্রান্তির এই অমানিশা ঘোচাতে সক্ষম।

(লেখক একজন সাহিত্য-সমালোচক ও বিশিষ্ট পুরাণবিদ)

চীনের ভারতীয় ভূখণ্ড দখল
সংবাদ-পরিবেশনে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন

ভারতের সেভেন সিস্টার্সের অন্তর্ভুক্ত অরুণাচল প্রদেশের প্রায় ষাট কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে পড়েছে চীনের সেনাবাহিনী পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)। ভারতে ভূখণ্ডে ঢুকে নাকি অরুণাচল প্রদেশের আঞ্জাও জেলার কাপাপু এলাকায় ক্যাম্পও করেছে তারা। গত ৮ সেপ্টেম্বর সরেজমিন ঘুরে তৈরি করা এক প্রতিবেদনে 'চাঞ্চল্যকর' এই তথ্য প্রকাশ্যে আনে অরুণাচলের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম নিউজফাই। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশের কাপাপু এলাকায় গভীর বনে আগুন ধরানো, পাথরের গায়ে রং ব্যবহার করে লেখা চীনের নাম এবং চীনা খাদ্যসামগ্রীর ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে, সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ আগেই চীনের সেনারা ঢুকেছিল।

'নিউজফাই'য়ের প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পাথরের গায়ে ইংরেজিতে ২০২৪ সাল লেখা রয়েছে। ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজেদের মালিকানা দাবি করার অংশ হিসেবে অনুপ্রবেশের পর চীনা সেনাবাহিনী এই কৌশলের ব্যবহার করছে বলে ওই প্রতিবেদনের দাবি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দুই দেশকে বিভক্তকারী ম্যাকমোহন লাইনের হাদিগ্রা পাসের কাছের কাপাপুতে ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশের (আইটিবিপি) একটি ক্যাম্পের অবস্থান রয়েছে। আর আঞ্জাও জেলার নিকটতম প্রশাসনিক এলাকা চাগলাগাম ম্যাকমোহন লাইন থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এছাড়া চাগলাগাম থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে পার্বত্য এলাকায় গ্লাইতাকরু পাসের অবস্থান।

মূলত অরুণাচলের চীনা নিউজ এজেন্সির ওপর ভিত্তি করে এদেশের প্রথম সারির বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম 'স্থানীয় সূত্রের খবর' হিসেবে চীনের ভারতীয় ভূখণ্ড দখলের খবর পরিবেশন করেছে। ঘটনাটি যদি প্রকৃতই ঘটে থাকে, তা যথেষ্ট উদ্বেগের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ধরনের গুজব বা ভুয়ো খবর প্রায়শই রটানো হয়। কারণ ইতিহাস বলছে, ১৯৬২ সালের যুদ্ধে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং সংলগ্ন এলাকার একটা বড়ো অংশ দখলে রেখেছিল চীন। ১৭ হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙের সেই দখল করা অংশ পরে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় চীন।

চীন চাইছে তাওয়াং পোস্ট দখল করতে। তাহলে তারা তিব্বত ও এলএসি দুটি দিকেই নজরদারি রাখতে পারবে। এছাড়াও দালাই লামার সঙ্গে তাওয়াঙের যোগ রয়েছে। ১৯৫৯ সালে চীনের দখলে থাকা তিব্বত থেকে পালিয়ে এসে অরুণাচল প্রদেশে প্রথমে আশ্রয় নেন দলাই লামা। এছাড়া তাওয়াং ও চাম্বা উপত্যকা ভারতীয় সেনার জন্য কৌশলগত দিক থেকেও বেশ প্রাসঙ্গিক। কারণ তাওয়াং থেকে ভুটান সীমান্তে এবং চাম্বা থেকে নেপাল-তিব্বত সীমান্তে নজরদারি চালায় ভারত। এদিকে, চীনের দাবি অনুযায়ী, অরুণাচলের একটা বড়ো অংশ তাদের এবং সেইসূত্র ধরে দুটি বিশেষ সেনা পোস্ট দখল করতে চায় চীন। যা পেলে অরুণাচলে নিজের দাবি জোরদার করার বার্তা দিতে আগ্রাসী বেজিং।

২০২০ সাল নাগাদ গালওয়ান উপত্যকায় সংঘাতে ভারতীয় সেনার বীরত্বের কথা সবারই জানা। মুখের ওপর জবাব দিতে ভারতের দিক থেকেও কোনো খামতি থাকে না। বলার কথা, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল সাফল্য, ষাটটি আসনের মধ্যে বিয়াল্লিশটিতে জিতে সরকার গঠন, নয়াদিল্লিকে চীনের বিরুদ্ধে লড়াইতে যে বাড়তি উদ্যম জুগিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনের আগ্রাসন নিয়ে অরুণাচল রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী দাসাংলু পুল বলেছেন, 'স্থানীয়দের মতে, চীনা সেনারা কাপাপু জেলা প্রবেশ করেছিল এবং চলে যাওয়ার আগে কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেছিল।'

যদিও পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতের একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা অনুপ্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, 'যে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে থাকে।' তিনি দাবি করেন, পিএলএ সেনারা ভারতীয় ভূখণ্ডের ৬০ কিলোমিটার ভেতরে অনুপ্রবেশ করেছে এটি মিথ্যা। কারণ এখানকার সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত না হওয়ায় এটি ঘটে থাকে। দুই পক্ষের সেনারা টহল দেওয়ার সময় একে অন্যের ভূখণ্ডে না বুঝেই ঢুকে পড়ে। তারা কখন যে শত্রুর ভূখণ্ডে রয়েছে তা বুঝতে পারে না। তিনি এও বলেন যে, ঘটনাটি বাফার জোনে ঘটে থাকে। এসময় জনগণকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

যাইহোক, ভারতীয় সেনাবাহিনী পুরো পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রাখুক এটুকুই শুধু কাম্য। আর দেশবাসীকেও বুঝতে হবে, কেউ ভারতীয় ভূখণ্ডের দখল নেবে আর ভারত হাত গুটিয়ে বসে থাকবে বিষয়টা এতটা সোজা নয়। চীনের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে ভারত যেমন আমেরিকাকে পাশে পেয়েছে, নিঃসন্দেহে এটা ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য, অন্যদিকে সামরিক ক্ষেত্রেও ভারত এখন অনেক শক্তিশালী। আর দেশের সরকারও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আপোশহীন মনোভাব নিয়েছে। □

বঙ্গ রাজনীতিতে তৃণমূল-বাম জোট কি সময়ের অপেক্ষা?

চাণক্য পণ্ডিত

প্রবন্ধটির শিরোনাম দেখে চমকে ওঠার কিছু নেই। বামফ্রন্ট তখন প্রায় পাঁচ বছর হলো ক্ষমতায় এসেছে। আশির দশক থেকে বামফ্রন্টের সমস্ত সভায় বক্তব্যের বিষয় ছিল একই— সঞ্জয় গান্ধী থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি ত্রয়ী— প্রিয়-সুব্রত-সোমেনের গুন্ডামি, মস্তানি, বেলেল্লাপনা, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনাচার, সিদ্ধার্থ শঙ্করের আমলের পুলিশি অত্যাচার, কংগ্রেস ঘাতকরা কত বামফ্রন্ট কর্মীকে হত্যা করেছে তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা এবং শেষে মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া যে তারা কি সেই বাহাত্তরের কালো দিন আবার ফিরিয়ে আনতে চায়?

কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্বের প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু বিশেষত পূর্ববঙ্গ থেকে আসা শরণার্থী। তাই তারা বিচিত্র রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রয়োগ ঘটিয়ে হিন্দু সমাজের অধিকাংশের মাথা চিবিয়ে খেতে পারলেও মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়নি। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের কাছে কালক্রমে কমিউনিস্ট হওয়া একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, নেতৃত্ব হিন্দু হওয়ায় মুসলমান সমাজের থেকে তাদের একটা মানসিক দূরত্ব থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, ইসলাম ও কমিউনিজম দুটোই সেমেটিক চিন্তাধারা। এরা শুধু নিজেদের অস্তিত্বেই বিশ্বাসী এবং একে অপরকে শত্রু মনে করে। তাই কোনো ইসলামি দেশে কমিউনিজম দেখা যায় না, আবার কমিউনিস্ট দেশে মুসলমানদের অবস্থাও করুণ। এপার-ওপার দুই বঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনেকটা এক হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু হিন্দু গরিষ্ঠ নেপালে নেপালি কংগ্রেসের নেতারা এবং নেপালের রাজতন্ত্র কমিউনিস্টদের প্রতি গণতান্ত্রিক উদারতা দেখানোয় ধীরে ধীরে তারা শক্তি সঞ্চয় করে এবং নেপালের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ইসলাম, কমিউনিস্ট ও হিন্দুত্বের মধ্যে এটাই পার্থক্য। ওপার বঙ্গে মুসলমান গরিষ্ঠ হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি যা করতে পারেনি, এপার বঙ্গে হিন্দু গরিষ্ঠ হওয়ার সেটাই করতে পেরেছে অর্থাৎ নেপালের মতো ক্ষমতা দখল। মজহবি নির্দেশের জেরে এখানকার মুসলমানরা কমিউনিস্ট পার্টিকে বহু বছর ধরে ভোট দিলেও মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি।

যদিও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ইত্যাদি জেলার মুসলমানরা মূলত কংগ্রেস থেকে যায়। যার ফলে উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস মোটামুটি নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল। দক্ষিণবঙ্গের হিন্দুবহুল জেলাগুলি কলকাতা, হাওড়া শহরতলিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দুরা তো অধিকাংশই কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিল। কংগ্রেসি অরাজকতায় মানুষ অতিষ্ঠ হয় এবং তালেগোলে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পর ধীরে ধীরে স্থানীয় হিন্দুরাও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। এর পেছনে অবশ্য অপারেশন বর্গার একটা ভূমিকা ছিল। অদ্ভুত বিষয় হলো এই যে বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে প্রায় সবাই ছিল মুসলমানদের প্রতিহিংসার কারণে ওপার বঙ্গ থেকে আসা হিন্দু, অথচ তারাই স্থানীয় বড়োলোক হিন্দুদের জমি কেড়ে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বিলি করে। মুসলমান গরিষ্ঠ কংগ্রেসি আধিপত্যের জেলাগুলিতে কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার স্থানীয় ধনী মুসলমানদের জমি সেই ভাবে বর্গা অপারেশনের নামে অধিগ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারেনি। তাই উত্তর চব্বিশ পরগনার শিয়ালদা থেকে বনগাঁ, বসিরহাট এবং দক্ষিণে শিয়ালদা থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং পর্যন্ত রেল লাইনের দুপাশে সরকারি জমিতে হিন্দু উদ্বাস্তুরা নারকীয় অবস্থার মধ্যে থাকলেও, তাদের কিন্তু মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, মালদহের মুসলমান ভূস্বামীদের জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি।

বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর ক্ষমতার মধু থেকে বঞ্চিত কংগ্রেসি হুলিগানরা কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢুকে পড়ে। বামফ্রন্টের এলাকা দখলের রাজনীতিতে এই বাহুবলীরা প্রথম সারিতে এসে যায়, ফলে বামফ্রন্টের কংগ্রেসায়ন শুরু হয় এবং বামফ্রন্ট শাসন শুরুর পনেরো বছর পর থেকে বামফ্রন্টের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচার কংগ্রেসিদেরও ছাড়িয়ে যায়। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে কমিউনিস্ট পলিটব্যুরোর বোঝাপড়ায় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসি ত্রয়ী— প্রিয়-সুব্রত-সোমেনের সঙ্গে বঙ্গ বামফ্রন্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ নির্বাচনে তারা যেখানেই দাঁড়াবেন তাদের জয় নিশ্চিত, কংগ্রেসের জন্য ৭০ থেকে ৯০টি আসন (যার অধিকাংশই উত্তরবঙ্গের মুসলমান গরিষ্ঠ জেলার এবং কিছু এপারের বাঙ্গালি অধ্যুষিত গোঁড়া কংগ্রেসি গরিষ্ঠ অঞ্চল) এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রায় ৩৮-৩৯ শতাংশ ভোট এই চুক্তি অনুযায়ী নিশ্চিত হয়।

এই প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে তরমুজ কংগ্রেস ধারণার উৎপত্তি। মমতা ব্যানার্জির কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তৃণমূল গঠনের কথা সবাই জানে। এরপর শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়। মমতা ব্যানার্জির ওপর প্রাণঘাতী হামলা, বহু তৃণমূল কর্মী খুন, গ্রাম ছাড়া এবং তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো— এ সবের বিনিময়ে ২০১১ তৃণমূল ক্ষমতায় আসে। এরপরের ঘটনা পরম্পরার রাজনৈতিক বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। এত হিংস্রতার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসার পরেও রাজ্যের মানুষ শুনলো পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র সংগীত। বামপন্থীদের ওপর হামলা হলো না। নবান্নে পরাজিত বামনেতাদের সৌজন্যমূলক ফিশ ফ্রাই খাওয়া দেখে বাঙ্গালি গদগদ হলো। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কিন্তু মাত্র ১০ বছর যেতে না যেতে এরাজ্যে রাহুর প্রত্যাবর্তন, সঙ্গে দোসর কেতু! শুধু তাই নয়, নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলে, হিংসা থাকলে প্রতিহিংসা থাকবে। কিন্তু তৃণমূল বললো এখন তো কোয়ান্টাম যুগ। নিউটনের

ফঃ ২

সূত্র অচল। তাই হিংসা ছাড়াই প্রতিহিংসা চলবে এবং এই সূত্রের প্রয়োগ হলো বেচারি অহিংস্র, অহিংস বিজেপি কর্মীসমর্থকদের ওপর। তারা তো মনেই করতে পারছে না যে, পশ্চিমবঙ্গ তো দূর, যে যে রাজ্যে বিজেপি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আছে সেসব রাজ্যেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর বিজেপি কখনো কোনও সন্ত্রাস চালিয়েছে কিনা। আজকে যখন তৃণমূলের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির উত্থান ঘটেছে তখনও যদি সন্ত্রাস না হতো তাহলে নিশ্চিত বলা যেত যে মমতা প্রতিহিংসা পরায়ণা নন। কিন্তু বিজেপি কর্মীদের ওপর ধারাবাহিক সন্ত্রাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে মমতা মোটেই উদার নন বরং হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

বাস্তবে বামফ্রন্ট আমলের মতোই এখন বিজেপি কর্মী খুন, গ্রামছাড়া করা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো এসব তো আছেই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে অভিনব গাঁজা কেস দেওয়া। কংগ্রেস ভেঙে বেরিয়ে আসা মমতা সিপিএম হঠানোর আন্দোলন শুরু করায় প্রতিবাদহীন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত জমিদারি মেজাজের জ্যোতি বসুর অহং বোধে আঘাত লাগে এবং ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ও তার দল মমতা ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। কিন্তু তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যায়। জ্যোতি বসুকে কারাত-ইয়েচুরির প্রধানমন্ত্রী হতে না দেওয়া, তারপর জ্যোতি বসুকে তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কায়দা করে নির্বাচনে দাঁড়াতে না দেওয়া এবং সবশেষে বুদ্ধদেবের নেতৃত্বে উন্নততর বামফ্রন্টের স্লোগান ছিল জ্যোতি বসুর গালে চড়। শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। জ্যোতি বসু ও তার সহযোগী সুভাষ চক্রবর্তী প্রমুখ নেতা ও অনুগামীরা ঠিক করে যে কারাত-ইয়েচুরি এবং তাদের নীতির সমর্থক অনিল-বুদ্ধ- বিমানকে একটু শিক্ষা দিতে হবে। তার আগে পর্যন্ত মমতা অনেক কসরত করেও শেষ পর্যন্ত একটুর জন্য প্রতিপক্ষকে চিৎ করতে পারছিলেন না।

সেই প্ল্যানমাফিক জ্যোতি গোষ্ঠীর অনুগামীরা দলে দলে তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে মিটিং মিছিলে যোগ দিলে তৃণমূলের পাল্লা ভারী হয়ে যায় এবং এই গোষ্ঠীর অনুগামী সরকারি কর্মচারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তৃণমূলকে ২০১১-র নির্বাচনে জেতাতে সাহায্য করে। রবীন্দ্র সংগীত, বামপন্থীদের বিরুদ্ধে পালটা সন্ত্রাস না করা, জন্মদিনে জ্যোতি বসুকে প্রণাম এসব উচ্চ সংস্কারজাত উদারতা নয়, বরং সেই গোপন সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। এতদূর পর্যন্ত আলোচনার মূল নির্যাস হলো বামফ্রন্টের একটা অংশের সঙ্গে তৃণমূলের বোঝাপড়া আগে থেকেই আছে।

নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর বিমান গোষ্ঠী যখন মণিহারা ফণী, তখন বঙ্গের রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে তারা মমতাকে বিজেপি জুজু দেখানোর জন্য নবান্নে গিয়েছিলেন। এখনকার এই সোশাল মিডিয়া জগতে কোনও কিছু গোপন থাকে না। সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে ডেলোর মিটিংও জানাজানি হয়ে যায়! গোপনে মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ জানাজানি হলে সবাই এই আঁতাত ভালোমতো বুঝতে পারবে তাই তারা সবাইকে জানা হলো সৌজন্যের অছিলায় এই সাক্ষাৎ। বামপন্থী নেতৃত্ব মমতাকে বলে যে তৃণমূল-বামফ্রন্ট লড়াইটা লোক দেখানো হোক। হিন্দুত্ববাদী বিজেপি-র বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আমরা আপনার সঙ্গে আছি। কেননা ধূর্ত বামপন্থীরা জানে যে তৃণমূল থাকলে তাদের ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে কিন্তু একবার বিজেপি ক্ষমতায় এলে সে রাস্তা চিরতরে বন্ধ। তাই যদি তারা নিজেরা ক্ষমতায় আসতে না পারে তাহলে তৃণমূল থাকুক। কোনও অবস্থায় যেন বিজেপি আসতে না পারে। তারা তৃণমূলকে কেরালা মডেল বুঝিয়েছে, সেখানে একবার কংগ্রেস, পরেরবার বামফ্রন্ট এইভাবে চলছে। এখানেও সেরকম হতে পারে— তৃণমূল-বামফ্রন্ট, বামফ্রন্ট-তৃণমূল। কেরালায় মুসলমান খ্রিস্টান মিলে প্রায় ৪৫ শতাংশ, হিন্দু ৫৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান খ্রিস্টান প্রায় ৩৫ শতাংশ। সংখ্যার নিরিখে অবশ্য হিন্দু ৬৫ শতাংশ। কিন্তু হিন্দু নামধারী কমিউনিস্টদের একটা বড়ো অংশ সেই অর্থে হিন্দু নয়, প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণকারী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য যাদের প্রতিনিধি। অতএব জনচিত্র একেবারে আদর্শ। ধীরে ধীরে প্রায় কেরালার মতো হতে যাচ্ছে। তাই এখানে বিজেপিকে ব্রাত্য করে কেরালা মডেল চালু হতে পারে।

আরেকটি বিষয় হলো, যে বামফ্রন্ট কংগ্রেসি গুন্ডাদের গালি না দিয়ে জল খেত না, সবসময় ৭২-এর কালো দিনের কথা বলতো, তারাই সারাদেশে বিজেপি-র বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেছে। মতাদর্শের দিক থেকে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। বামপন্থীরা যদি কংগ্রেসি কালোদিনের কথা বেমালুম ভুলে তাদের সঙ্গে জোট করতে পারে, তাহলে যে তৃণমূল তাদেরকে পালটা মার দেয়নি তাদের সঙ্গে জোট করতে কোনও আপত্তি নেই। তৃণমূলেরও কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ বামপন্থীদের সঙ্গে ভবিষ্যতে জোট হলে মুসলমান ভোট হারানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটার। ২০২১-এ দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা ও হাওড়া শহরতলির কমপক্ষে ৫০ আসনে বামফ্রন্ট প্রায় ১২-১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে যদিও রাজ্যে তাদের প্রাপ্ত গড় ভোট প্রায় ৫ শতাংশ। তৃণমূলের প্রতি হিন্দু সমর্থন ক্রমাগত কমতে থাকলে যদি তৃণমূল-বামফ্রন্ট জোট হয় তবে ওই ৫০ আসনে বামফ্রন্টের হিন্দু নামধারী নাস্তিক কমরেডদের প্রায় ৮-১০ শতাংশ ব্লক ভোট তৃণমূলের পক্ষে যাবে এবং তাদের জয় সুনিশ্চিত করবে। অর্থাৎ জোট হলে তৃণমূলেরই লাভ। তাহলে তাদের আপত্তি থাকবে কেন?

এর সঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পরিবার তান্ত্রিক আঞ্চলিক দল ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বেশিদিন থাকলে তাদের পতাকা বহনের লোক থাকে না। কিন্তু বিষাক্ত কমিউনিস্ট, নকশাল— এরা সেই শুকনো বীজ, যা হয়তো সকলের অলক্ষ্যে এক কোনায় পড়ে আছে। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বিষঝাড় হয়ে গজিয়ে উঠবে।

দুর্নীতি-সহ নানাবিধ ব্যর্থতার কারণে তৃণমূলের যত জনসমর্থন ও আসন কমবে, ততই তারা হয় স্বেচ্ছায় নয় বাধ্য হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বামফ্রন্টের সঙ্গে এই জোটের পথে পা বাড়াবে। জাতীয় রাজনীতিতে ইন্ডিজোটের ভিতর যদিও তারা ইতিমধ্যে হাত মিলিয়েই রয়েছে। অবশ্য রাজনীতি অনেকটা গেম থিয়োরির মতো যেখানে উভয়পক্ষের হাতে অনেক অস্ত্র থাকবে, পাশার চাল থাকবে। কে কীভাবে তার ব্যবহার করতে পারে তার ওপর ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি অনেকটাই নির্ভর করে। তবুও সব মিলিয়ে আলোচনার চূড়ান্ত নির্যাস এটাই যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ভবিষ্যৎ পটভূমিতে বর্তমান সময়ের কংগ্রেস-বামফ্রন্ট জোটের মতোই তৃণমূল-বামফ্রন্ট জোট হয়তো সময়ের অপেক্ষা। □

নির্মাণ শিল্পী বিশ্বকর্মা পূজার দিনই এদেশের প্রকৃত শ্রমিক দিবস

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ভারতের শ্রমিক দিবস কবে? যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন তিনিই উত্তর দেবেন ১ মে। কোনো দেশের পালনীয় দিন বা উৎসব সে দেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ইতিহাস মেনে স্থির হয়। যেমন বাঙ্গালির উৎসব বললে দুর্গাপূজা, কালীপূজা বা পয়লা বৈশাখের কথা মনে হয়, ঠিক তেমনই দেশের উৎসব বললে মনে পড়ে রামনবমী, জন্মাষ্টমী বা বিজয়া দশমীর কথা। হাজার বছরের পরাধীনতাকালে বিদেশি শাসকেরা যেভাবে তাদের ইদ, ২৫ ডিসেম্বর বা ইংরেজি নববর্ষকে বলপূর্বক এদেশের উৎসব বলে চাপিয়ে গিয়েছিল, স্বাধীনতার ৬০/৭০ বছর পরেও স্বাধীন ভারতের সরকার সেই ধারা বজায় রেখেছে। সরকারি খাতায় আজও ভারতের শ্রমিক দিবস হলে ১ মে।

এখন প্রশ্ন, যে দেশ হাজার হাজার বছর ধরে শিল্পে, স্থাপত্যে বিশ্ববন্দিত ছিল, যে দেশের গান্ধার শিল্প, বস্ত্রবয়ন শিল্প, অলংকার শিল্প, স্থাপত্য শিল্পের বিশ্বজোড়া খ্যাতি, যে দেশের তথ্য প্রযুক্তি কপি করে পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা— সেই দেশের নিজের কোনো জাতীয় শ্রম দিবস কি নেই? থাকলে সেটি কবে? তা ১ মে না অন্য কোনো দিন? মে দিবস প্রকৃতপক্ষে কী? এদেশের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? '১ মে'-র ইতিহাসটাই বা কি? এ প্রশ্নগুলি ওঠা কি স্বাভাবিক নয়?

তবে সেই ইতিহাস জানতে আমাদের একটু পশ্চিমের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। তখন ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা মহাদেশজুড়ে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলাম আগমনের আগেও এর সূত্রপাত হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা গরিব মানুষদের অর্থের বিনিময়ে কিনে দাস হিসেবে তাদের ইচ্ছা মতো কাজ করাতো। সেই দাসেদের প্রতিবাদের কোনো পথ ছিল না। ধনবানরা এই দাসদের ঘরে, শিল্পে, কারখানায় ১০, ১২, ১৫ ঘণ্টা খাটিয়ে নিত ন্যূনতম কেবল খাদ্যের বিনিময়ে। সামান্যতম প্রতিবাদে জুটত অবর্ণনীয় অত্যাচার। এরকম এক পরিস্থিতিতে, দিনটা ছিল ১৮৮৬ সালের ১ মে, আমেরিকার চিকাগো শহরের হে-মার্কেটে কয়েক হাজার শ্রমিক জড়ো হয়েছিল ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে। শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে সেদিন উভয় পক্ষের ১০/১২ জন প্রাণ হারায়। অসহায় শ্রমিকের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল হে-মার্কেট চত্বর। ১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস। সেখানে রেমন্ড লাভিনে '১ মে'-কে শ্রমিক দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করার প্রস্তাব দেন। ঠিক পরের বছর কয়েকটি দেশে পালিত হলো মে দিবস। ইংরেজ রাজত্বে ১৯২৩ সালে কমরেড সিঙ্গারাভেলার নেতৃত্বে 'লেবার কিষান পার্টি অব হিন্দুস্থান' নামে একটি কমিউনিস্ট দল মাদ্রাজে প্রথম ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে, তারপর তা ধীরে ধীরে সারা দেশে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ভারতবর্ষ থেকে হাজার যোজন দূরে থাকা শিকাগোর শ্রমিক বিদ্রোহ ভারতের দেশের শ্রমিক দিবস কেন হবে? কেনই-বা কমিউনিস্টরা সারা দেশে এর প্রসার ঘটাবে? যে কমিউনিস্টরা এদেশে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের চরম সর্বনাশ করেছে, পশ্চিমবঙ্গে দশকের পর দশক 'চলছে না চলবে না' স্লোগান দিয়েছে, 'মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও' বলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়েছে,

বনধ, ধর্মঘট, লকআউট, গো-স্লো'র ফাঁদে ফেলে শ্রমিককে পথের ভিখারি বানিয়েছে, ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প ধরণ পশ্চিমবঙ্গকে শ্মশানে পরিণত করেছে, তারা কোন দাবিতে শ্রমিক দিবস পালন করবে? মে দিবস প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমে শ্রমিকের অধিকার ফিরে পাওয়ার দিন। তাই শ্রমিক শত্রু বামপন্থীদের '১ মে' নামটা মুখে আনা শোভা পায় না।

যেসব দেশে মানবতা হত্যাকারী দাস প্রথার প্রচলন ছিল সে দেশগুলির কাছে ১ মে'র গুরুত্ব অবশ্যই অপরিসীম। কিন্তু ভারতে? এ দেশে তো দাস প্রথা বলে কখনও কিছু ছিল না। এদেশের প্রাচীন পুঁথি, গ্রন্থ, ইতিহাসে এর কোনো উল্লেখ নেই। যে দেশে রামসেতু নির্মাণকারী বানরেরা শ্রীরামের পরম ভক্ত হয়, যে দেশে ভগবান কৃষ্ণ কপর্দকহীন সুদামার পদসেবা করেন, যে দেশে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেন— যে দেশে দাসপ্রথা বা শ্রমিক নির্যাতন তো অলীক কল্পনা। শিল্পের দেশ ভারতবর্ষে পূর্ব হতে পশ্চিম আর উত্তর থেকে দক্ষিণ— মন্দির প্রাসাদ, স্থাপত্যের যারা রূপকার, সেই বিশ্বকর্মার বরপুত্ররা যুগ যুগ পেয়েছে শিল্পীর সম্মান।

আজ থেকে চার হাজারেরও বেশি আগে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর আধুনিক নগরী যারা নির্মাণ করেছিলেন তারা কেউ 'দাস' ছিলেন না, ছিলেন সভ্যতার স্থপতি। দিল্লিতে অবস্থিত মানসিংহের প্রাসাদ (লালকেল্লা) বা আগ্রার বিশ্ববিশ্রুত শিবালয় তেজোমহালয় (তাজমহল) যারা নির্মাণ করেছিলেন তার কেউ লেবার ছিলেন না, ছিলেন অসাধারণ নির্মাণশিল্পী। দেশজুড়ে যারা সূর্যমন্দির, পদ্মনাভ মন্দির, লিঙ্গরাজ মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের মতো শত শত অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন, তারা কেউ এদেশে দাস-শ্রমিক ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বকর্মার বরপুত্র।

আমাদের দেশে শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্ক সৃষ্টি ও স্রষ্টার। পাশ্চাত্যে কখনোই তা ছিল না। ওই দেশগুলিতে নির্মাণকারীকে দাস-শ্রমিক বা লেবারের সম্মানই দেওয়া হতো। বাজারে যেমন হাঁস, মুরগি গোরু, ছাগল কেনা-বেচা হয়, সেখানে তেমনই শ্রমজীবী মানুষ কেনা-বেচা হতো। এদের যতখুশি খাটানো যেত। অসুখ-বিসুখেও রেহাই মিলত না। প্রতিবাদ করলে পিঠে পড়ত চাবুক। অমানুষিক পরিশ্রমে কেউ প্রাণত্যাগ করলে 'দাস বাজার' থেকে কিনে আনা হতো নতুন শ্রমিক। বিশ্বাস হচ্ছে না? আমেরিকান লেখক Harriet Beecher Stowe -এর লেখা বিখ্যাত বই 'আঙ্কেল টমস্ কেবিন' পড়ুন। অথবা জন হোপ ফ্রাঙ্কলিনের লেখা 'ফ্রম স্লেভলি টু ফ্রিডম' পড়ুন, নাহলে ফ্রেডরিক ডগলাসের লেখা 'টুয়েলভ ইয়ার্স এ স্লেভ' পড়ুন, অথবা ইতালিয়ান লেখক কুলেন ব্রায়ান্টের লেখা 'ডেথ অব স্লেভলি' পড়ুন, নতুবা সোভিয়েত রাশিয়ার লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা 'মাদার' পড়ুন —এগুলির ছত্রে ছত্রে পাবেন ওইসব দেশে শ্রমিক নির্যাতনের কাহিনি। আমেরিকার অধিবাসী কালো চামড়ার আফ্রিকান জন হেনরীর উপাখ্যান তো লোককথায় পর্যবসিত হয়েছিল। যাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী গণসংগীতকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস গান বেঁধেছিলেন— 'নাম তার ছিল জন হেনরি/যেন ছিল জীবন্ত ইঞ্জিন'। ঠিক এমনই অবর্ণনীয় পরিস্থিতিতে সে দেশে রচিত হয়েছিল ১ মে-র পটভূমি। যার সঙ্গে আমাদের দেশের এক তিলও সাযুজ্য নেই।

এদেশে 'নর'কে 'নারায়ণ' রূপে পূজা করা হয়। শিবজ্ঞানে জীবকে সেবা করা হয়। এদেশের প্রতিটি শ্রমিক আমার-আপনার ঘরের অন্যতম সদস্যের মতো। ভাই বন্ধু বা সখা সদৃশ— দাস তো কদাপি নয়। তাই সে দেশের শ্রমিক দিবস ভারতের শ্রমিক দিবস কী করে হবে?

ভারতের শ্রমিক দিবস— বিশ্বকর্মা পূজা। কেন? কারণ তিনি বিশ্বের প্রথম স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার। কখনোও তিনি আর্কিটেক্ট হয়ে দেবতাদের জন্য দেবপুরীতে নির্মাণ করেন সুবিশাল দেবলোক, কখনো শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী, আবার কখনোও-বা ধনপতি সওদাগরের অনুরোধে তৈরি করেন বেহুলা-লখিন্দরের লোহার বাসরঘর, কখনোও তিনি কার্পেন্টার হয়ে তৈরি করেন কাঠের আসবাবপত্র, আবার কখনোও-বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তৈরি করেন দ্রুতগামী শকট, জলজাহাজ আর আকাশযান। তিনি একাধারে কলকারখানার পূজনীয় দেবতা, তিনিই আবার অন্যধারে সুক্ষ্ম অলংকার নির্মাতা। তিনিই যুগে যুগে প্রস্তুত করেছেন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের বজ্র, দেবতাদের বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার। যা কিছু সৃষ্টি সবই বিশ্বকর্মার। ঠিক এ কারণেই বিশ্বকর্মা পূজার দিনে সমস্ত নির্মাণ শিল্পে তার আরাধনা করা হয়। ৩৬৪ দিন শিল্পে উৎপাদন, আর একদিন শিল্প-দেবের পূজা। এ দিনে কারিগরেরা তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বিশ্বকর্মার পায়ে রেখে তাঁর আশিস কামনা করে, আর আগামী দিনে তাঁর বরপুত্র হিসেবে সুনিপুণ নির্মাণ কার্যের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

পশ্চিমবঙ্গের দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকেরাও বিশ্বকর্মাকে শিল্প-স্রষ্টা হিসেবে তাঁদের কবিতা, কাব্যে, সাহিত্যে বিবৃত করেছেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতায় লিখছেন, 'বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা, কীর্তিকর কারু/ যে চতুর চেতনের চরুরালী চারু।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর শুভদৃষ্টি গল্পে এক মূক ও বধির কন্যার রূপ-লাবণ্য বর্ণনায় লিখেছেন, 'মেয়েটির সৌন্দর্য নিরতিশয় নবীন, যেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।' —অর্থাৎ বিশ্বকর্মা যে নির্মাণের দেবতা, সৃষ্টির কারিগর তা এদেশের মনীষীরাও উচ্চৈকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

এদেশে শিল্প-শ্রম-শ্রমিকের কথা উঠলেই বিশ্বকর্মার রূপ ফুটে ওঠে। তাই আমাদের কাছে বিশ্বকর্মা পূজার দিনই হলো প্রকৃত শ্রমিক দিবস। দেশের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘও (বিএমএস) তার জন্মলগ্ন হতে বিশ্বকর্মা পূজার দিনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রমিক দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে আসছে। তাদের মতে শিল্প হলো ঈশ্বর, আর শিল্পী হলো তার বরপুত্র। শরীরের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্পর্ক কী? শ্বাস-প্রশ্বাস থাকলে জীবন আছে, তা থেমে গেলে শরীর মৃত। কমিউনিস্টদের মতো শিল্প থামিয়ে দেওয়া নয়, লাল ঝান্ডা গেড়ে 'ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগান দেওয়া নয়, কলকারখানায় বনধ-অবরোধ- ধর্মঘট করা নয়। বরং মজদুর সঙ্ঘের স্লোগান 'দেশকে হিতমে করেঙ্গে কাম/কাম কে লেঙ্গে পুরে দাম।' দেশের স্বার্থে বেশি উৎপাদন করো। শ্রমিকের কাছে কর্মই হলো ধর্ম, উৎপাদনই হলো ঈশ্বরের আরাধনা। —এটাই তো প্রকৃত শ্রমিক দিবসের বার্তা।

স্বামীজী বলেছেন, 'নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙলের ফলা হতে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে। ভুনাওলার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে। ...আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরে না এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পদ। ...এত শক্তি, এত প্রীতি, এত ভালোবাসা, এত মুক্তি, চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম।' স্বামীজীর ভাষায় এই হলো ভারতের শ্রমিক সমাজ, এ দেশের প্রকৃত নির্মাতা, দেশ গঠনের বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মা পূজার শুভদিন উৎসব হোক এদের নামে— শ্রমিক দিবস হিসেবে। সারা দেশে চৌদিকে প্রেরিত হোক এই বার্তা— বিশ্বকর্মা পূজাই ভারতের শ্রমিক দিবস। □

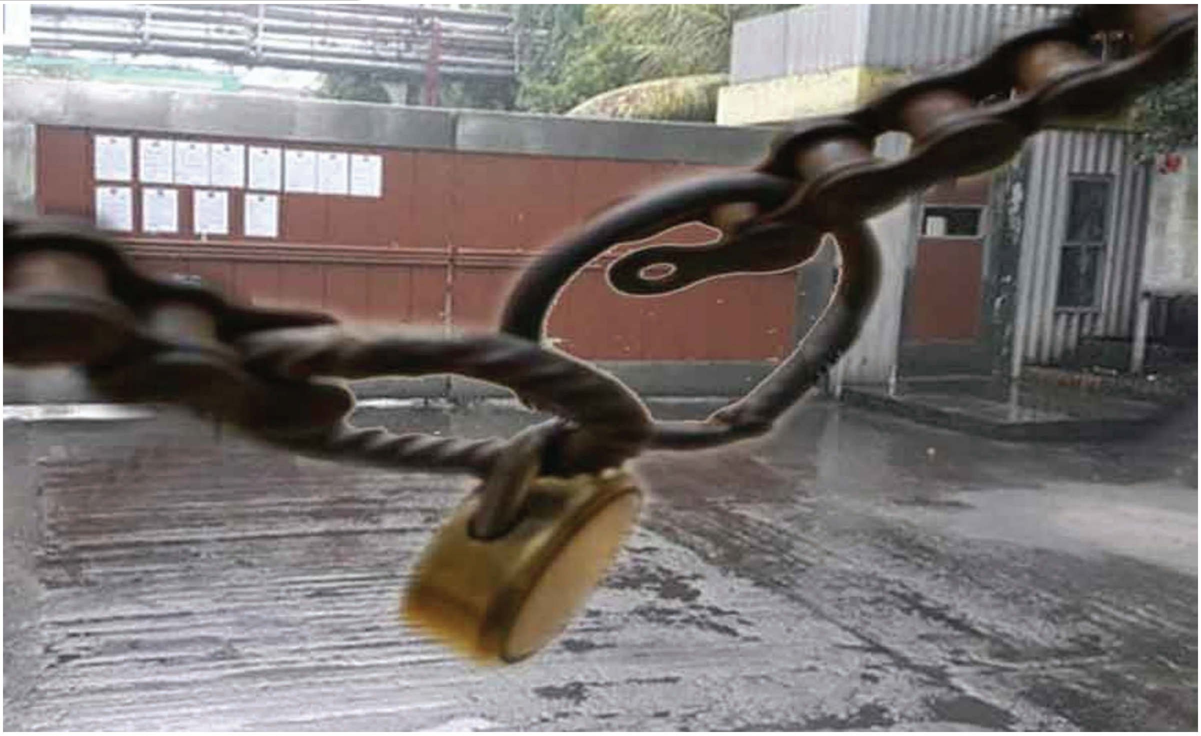

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-কারখানার অন্তর্জলি

বামেদের ভূমিকা

সুদীপ্ত গুহ

বামপন্থী শব্দটির সংজ্ঞা সবার কাছে সিপিএম, সিপিআই, এসইউসিআই, নকশাল বা বিভিন্ন খ্যাকশিয়াল হলেও, আমার কাছে সংজ্ঞাটা একটু আলাদা ও বৃহত্তম। দেশের বৃহত্তম বামপন্থী দলটি বারবার একটা জাতীয়তাবাদী চাদরে নিজেদের আসল বামপন্থী রূপটা লুকিয়ে রেখেছে। তারা হলো কংগ্রেসের নেহরু-ইন্দিরা গ্রুপ। যারা ১৯৬৯-তে নিজস্ব দল তৈরি করে। পশ্চিমবঙ্গের অবনতি শুরুর যদি ইতিহাস ধরা যায়, তবে ইন্দিরা গান্ধীর আগমনকেই ধরা যায়। রেকর্ড বলে ১৯৬৫ পর্যন্ত যাদবপুর, শিবপুর বা যে কোনো ডিপ্লোমা, আইআইটি কলেজে ডিগ্রিধারীদের পুরো চাকরি হতো এই রাজ্যে। কিন্তু ১৯৬৬-তে হঠাৎ বাজার খারাপ হয় এবং চাকরি প্রায় শূন্য হয়ে যায়। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত শিল্পের অবস্থা এতো খারাপ হয় যে আইআইটি ইঞ্জিনিয়াররাও ব্যাংক পিও, মিলিটারি-তে যোগ দেয়। বহু ইঞ্জিনিয়ার দেশ ছাড়ে।

কিন্তু ঠিক কি ঘটেছিল ১৯৬৬-তে?

পতন শুরু হয় অনেক আগেই আমাদের দেশে যেদিন মিশ্র অর্থনীতিকে অবলম্বন করে দেশ এগোতে থাকে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮-৫৯ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে ওঠে ওই টাকায়। তখন বহু বিদেশি কোম্পানি, ব্যাংক, বিমা কোম্পানিকে জাতীয়করণ করাও হয় ওই টাকায়। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় ওই দশকে অনেকেই চাকরি পায়। কিন্তু তৈরি হয় না কোনো স্থায়ী সম্পদ। ওদিকে অবহেলা করা হয় কৃষিরও। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই সমস্যা। এর মধ্যে দুটি যুদ্ধ। শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পর ইন্দিরা ক্ষমতায় আসতেই তাসের ঘরের মতো ভাঙতে থাকে দেশের অর্থনীতি। তৎকালীন সাহিত্য— জনঅরণ্য, চৌরঙ্গী, আপনজন ইত্যাদি থেকে আমরা সেই সংকটের বর্ণনা পাই।

কিন্তু কেন?

নেহরুজীর সময় ব্রিটেন থেকে পাওয়া টাকায় বাজে খরচ করলেও পরিকাঠামো তৈরি করা হয়নি এবং বেসরকারি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। শাস্ত্রীজী ও ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে সেই টাকা শেষ হয়ে গেলে নতুন শিল্প তৈরি করতে অক্ষম হয় সরকার। এর মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী দল থেকে পুরোনো জাতীয়তাবাদীদের তাড়িয়ে নিজের দল তৈরির পরিকল্পনা করলেন। মানুষের করের টাকায় শুরু হলো গণজাতীয়করণ। আর টাকা শেষ হয়ে

যেতেই, বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধ্য করা হয় গান্ধী পরিবারের প্রিয় ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁদের কোম্পানি বিক্রি করে দিতে। ফলে চা বাগান থেকে কাপড় কল, পাটকল থেকে কৃষি/মৎস্যচাষ বা হাওড়ার ভারী শিল্প চলে আসে কিছু অসৎ ব্যবসায়ীদের হাতে, যাদের ব্যাপারী হবার অভিজ্ঞতা থাকলেও শিল্প পরিচালনা বা আন্তর্জাতিক ব্যবসার অভিজ্ঞতা নেই। ফলে ধীরে ধীরে তারা বাজার হারায়। শিল্প বাজার হারানোর ফলে প্রভাব পড়ে তাঁদের সাপ্লায়ারদের ব্যবসায় এবং কর্মচারীদের চাকরির সুযোগ সুবিধায়। বহু কারখানা বন্ধ হয় এবং ছাঁটাই হয় বহু কর্মচারী। বন্ধ হয় ব্যবসা।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, আমেরিকা তাঁদের সহযোগিতা বন্ধ করলে, তারা ভারতের মাধ্যমে তাঁদের পুঁজি জোগাড় করে আমেরিকা থেকেই যন্ত্র আমদানি করে। আমাদের দেশ থেকে তারা বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল নিয়ে যায়। কিন্তু বন্ধ করে দেয় কলকাতা শিল্পাঞ্চলকে কাঁচা পাট রপ্তানি। বন্ধ হয় পাটকল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ১৯৭২-এ ক্ষমতায় এলে কিছুটা জোর দেন পরিকাঠামোতে। যেমন মেট্রো রেল, দ্বিতীয় হুগলী সেতু তথা বিদ্যাসাগর সেতু, বিদ্যুৎ বণ্টন ইত্যাদি। কিন্তু কিছু ভুলও করেন। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টাকায় তৈরি করেন নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম। শুরু হয় সল্টলেকের নগরীকরণ।

এই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে বামফ্রন্ট ১৯৭৭-এ। জ্যোতি বসুর সাড়ে তেইশ বছরকে যদি একলাইনে বর্ণনা করা যায় তা হলো অদক্ষ, দলতান্ত্রিক, স্বজনপোষণসর্বস্ব, আমলানির্ভর অবহেলামূলক, স্বৈরাচারী, দিশাহীন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দুটি যুগ। জ্যোতি বসু শিখিয়ে গেছেন ইতিবাচক কিছু না করেও, শুধু মাত্র সঠিক রাজনৈতিক আঁতাত নিশ্চিত করে দশকের পর দশক কীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। আগেই বলেছি, সিপিএম মূলত চীনপন্থী কমিউনিস্ট দল যার প্রথম লক্ষ্য 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'। কিন্তু জন্মের তিন বছরের মধ্যেই, ১৯৬৭-তে, তাদের প্রথম ক্ষমতালাভ দক্ষিণপন্থী অজয় মুখার্জীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে। ১৯৭৭-তে যে জনতা পার্টিকে সমর্থন করে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলেন, তা ছিল কিছু দক্ষিণপন্থী দলের একটি সংযুক্ত মোর্চা। ১৯৮০-তে ইন্দিরা গান্ধী ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে আপোশ করে নেন জ্যোতি বসুর দল। সোভিয়েতপন্থী সিপিআইকে বামফ্রন্টের অংশীদার বানান ১৯৮২-তে ইন্দিরা গান্ধী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল পার্টিকে খুশি করতে।

জ্যোতি বসু দেখেন, শিল্প আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু এমন একটা পদ্ধতি বের করতে হবে যাতে অবশিষ্ট শিল্পকে লুটে নেওয়া যায়। কিন্তু সেটা কীভাবে?

এক, বিআইএফআর-এ কোম্পানিকে পাঠানো। ২০১৬-র আগে আমাদের দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেকশন-১১-এর মতো কোম্পানি বন্ধ করার কোনো আইন ছিল না। মূল প্রোমোটার কোম্পানিকে ছিবড়ে করে, ব্যাংক, শ্রমিক ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ডুবিয়ে তাদের কারখানাগুলি বিআইএফআর-এ পাঠানো শুরু করল। বছরের পর বছর বিচার চলত। অর্থনীতিবিদ, সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী সম্পূর্ণ নীরব ছিল। মুখ খুললেই হয় যতীন চক্রবর্তী নয় সন্তোষ ভট্টাচার্য।

দুই, কারখানা বন্ধ করে জমিতে প্রোমোটিং। হয় শপিং মল, নয় বহুতল। ঊষা, বেঙ্গল ল্যাম্প-এর মতো হাজার হাজার উদাহরণ এই হুগলী নদীর দুধারে আজ আমরা দেখতে পাই। হাজার হাজার শ্রমিক দিল্লি, বোম্বেতে পরিযায়ী হয়ে গেল।

তিন, বাম সরকার 'শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর' নামে একটা দপ্তর বানাল। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলিকে এই দপ্তর ব্যাংক থেকে ঋণ পাইয়ে দিত। বহু বন্ধ জুটমিল, পেপার মিলের মালিক ঋণ নেন। পুনরায় শুরু হবার পর দু'চার মাস কারখানা চালিয়ে টাকাপয়সা সরিয়ে ওই কারখানা বিআইএফআর-এ পাঠিয়ে এরা নিশ্চিন্তে ঘরে বসে ঘুমাতেন। শ্রমিকনেতারা এই অন্যায়ের সমান ভাগীদার ছিলেন। ফলে ঘুম ভাঙাবে কে?

এভাবে শিল্পাঞ্চল যখন শ্মশানে পরিণত, তখন ১৯৯১ ভারতে নতুন রাস্তা খুলে গেল হঠাৎ। লাইসেন্স রাজ, কোটা রাজ, মাসুল সমীকরণ উঠে গেল। দেশের অর্থব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনলেন নরসিমা রাও। সারাদেশে TCS/INFOSYS/WIPRO/SATYAM/CTS/IMB/Microsoft/Sun Microsystems/Cisco/Intel Accenture এবং হাজার হাজার প্রযুক্তি কোম্পানি সীমাহীন সুযোগ নিয়ে এল যুবকদের জন্য। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত প্রযুক্তিবাণিজ্যে বিশ্বমানচিত্রে জায়গা করে নিল। ব্যাঙ্গালোর শব্দটি 'ক্রিয়াপদ (Verb)' হিসেবে ইংরেজি অভিধানে জায়গা করে নিল। এদিকে জ্যোতিবাবু শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ গাঙ্গুলীকে শিল্প মন্ত্রী, শঙ্কর সেনকে বিদ্যুৎ মন্ত্রী ও সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান করেন। পশ্চিমবঙ্গ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। কিন্তু শুরু হলো নতুন খেলা। 'কাটমানি' সিপিএম-এর শব্দকোষে ছিল না। এরা 'ফুলমানি'তে বিশ্বাসী ছিল। ড. অসীম দাশগুপ্ত নরসিমা রাওয়ের উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে বাজালেন তাঁর রণশঙ্খ। ঘোষণা করলেন, তাঁর 'বিকল্প অর্থনীতি'। বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, ঠিক যেমন ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র পিতামহ ভীষ্মের শঙ্খধ্বনি শুনে হরষে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে।

কম্পিউটার শিল্পের বিকল্প হিসেবে তিনটি বিকল্প শোনালেন অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত তাঁর আকাশবাণীতে— মডেল ১. জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি। মডেল ২. চিট ফান্ড। মডেল ৩. প্রোমোটিং ও আবাসন।

কমিউনিস্টদের অপরাধপ্রবণতা এবং আর্থিক নীতি (দুর্নীতি)-র মধ্যে একটি সুন্দর চারিত্রিক মিল আছে। অপরাধীদের খাবার পাতের চাটনির মতো সব দলই অল্পবিস্তর রাখে। কিন্তু অপরাধীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে পুনর্বাসন দেবার উদাহরণ দিয়ে গেছে বামফ্রন্ট। কংগ্রেস, বিজেপি বা অন্যান্য আঞ্চলিক বা পরিবারভিত্তিক দলেও খারাপ লোক থাকে। কিন্তু তাদের অন্যায় আদালতে প্রমাণ হলে, দল সেই নেতার পাশে দাঁড়ায় না। যদিও আদালতে ছাড়া পেয়ে অনেকেই পুনরায় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে, এমন

উদাহরণও আছে। কিন্তু সিপিএম যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের জেল থেকে মুক্ত করে, তাদের নাম পরিবর্তন করে সাংসদ, মন্ত্রী, দলের সম্পাদক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদে বসিয়েছে। এমনভাবে তাদের পরিচয় পরিবর্তন করা হয়েছে, যে ভবিষ্যতে তাঁদের মূল পরিচয় পাওয়া যাবে না। সামাজিক, রাজনৈতিক অপরাধের মতো আর্থিক নীতিতেও সিপিএম বেশ সংগঠিত। আর্থিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের অনেক নেতা বহু সময় কাটমানি, ঘুষ নিয়েছে, নিয়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু সিপিএম ঘুষ বা কাটমানিতে বিশ্বাসীই নয়। তাঁরা তাদের সিস্টেমকে এমনভাবে সাজিয়েছিল, যাতে পরিষ্কার রাখা হতো যে দেখে কেউ তাঁদের ভবিষ্যতে ধরতে পারবে না। গত ন' বছরে মমতা ব্যানার্জীও এই কাজ পারেননি।

১৯৯১-তে নরসিমা রাও দেশে উদার অর্থনীতি চালু করলেন। 'উদার' নাম দেওয়া হয় কারণ, সরকার লাইসেন্স রাজ, কোটা রাজ, মাসুল সমীকরণ তুলে বহির্বিশ্বে বাণিজ্যের রাস্তা খুলে দিয়েছিল। অসীম দাশগুপ্তরা প্রথম ১৪ বছরে (১৯৭৭ -১৯৯১) সার্বিক ব্যর্থতার কারণ হিসেবে কেন্দ্রের এই নীতিগুলিকেই চিহ্নিত করতেন। তাহলে পরের পাঁচ বছর তাঁরা উদারনীতির বিরোধিতা করলেন কেন? মিটিং, মিছিল করে উদার অর্থনীতি ও নরসিমা রাওয়ের মুণ্ডপাত করেছিলেন কেন প্রকাশ্যে? কারণ তাঁরা নিজেদের অদক্ষতা, অকর্মণ্যতা সম্পর্কে একশত শতাংশের উপর নিশ্চিত ছিলেন। ভবিষ্যতে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করবে, মাসুল সমীকরণ তো গেল? এবার তো করে দেখান? কী উত্তর দেবেন? উত্তর আগেই তৈরি— 'কেন্দ্রের দোষ'। যখন সারাদেশে টিসিএস/ইনফোসিস/ ইউপ্রো/সান মাইক্রোসিস্টেম/ ইন্টেল/ সিসকো/মাইক্রোসফট/IBM/PWC/ KPMG/জেলয়েট প্রযুক্তির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে, তখন MIT ফেরত অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত ঘোষণা করলেন 'বিকল্প অর্থনীতি'।

প্রথম ধাপেই শুরু হলো জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি। ৭৬ শতাংশ বেসরকারি ও ২৪ শতাংশ সরকারি মালিকানা নিয়ে বহু কোম্পানি খোলা হলো। শুধু হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল বাদে। সেখানে সরকারের বিনিয়োগ বেশি ছিল পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জির চেয়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে, যা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এখন প্রশ্ন জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পার্থক্য কী? রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ন্যূনতম ৫১ শতাংশ শেয়ার সরকারের থাকে এবং কর্মীরা সরকারি আধিকারিক বা কর্মচারীদের সমান বেতন ও সুযোগ সুবিধা পান। কিন্তু জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিতে সরকারের তরফ থেকে ৫০ শতাংশের কম শেয়ার এবং সরকার সেখানে নামমাত্র দু-একজন মনোনীত ডিরেক্টর পাঠাতে পারে। পুরো পরিচালনা বেসরকারি হাতে। কিন্তু সরকারের ২৪ শতাংশ বা ২৬ শতাংশের শেয়ারের দৌলতে এই কোম্পানিগুলো সরকার থেকে বিভিন্ন সুবিধা পেত যা মুক্তবাজারে সাধারণ বেসরকারি কোম্পানিগুলি পেত না। সুবিধা বলতে, বিনা টেন্ডারে সরকারি কাজ, জলের দরে জমি ইত্যাদি। কিন্তু এদের বেশিরভাগ কোম্পানিই অধিকাংশ আর্থিকবর্ষে খুব কম লাভ দেখাত কিংবা তাও দেখাত না। সরকারের বিনিয়োগের উপর ১৫/২০ বছরে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (আইআরআর) যা ছিল, তার থেকে ব্যাংকে টাকা রাখলে সুদ বেশি পাওয়া যেত। এদের কাজ মূলত আবাসন শিল্পে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সব কোম্পানিতে চাকরিও পেত মূলত পার্টি কর্মী বা আমলাদের স্বজন-পরিজনরা। এদের ভেন্ডর, ঠিকাদার কে হবে তা ঠিক করত পার্টি। এরা সরকারি ছাপের জন্য ব্যাংক থেকেও সহজে ঋণ পেত, যা অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা পেত না। এদের চক্র এমন একটা CARTEL ব্যবস্থা বানিয়ে রেখেছিল যে দিল্লি, বোম্বে বা দক্ষিণের দক্ষ বেসরকারি সংস্থা বা বহুজাতিক সংস্থার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে এসে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ব্যবসা করা বেশ কষ্টকর ছিল। ফলে সাধারণ প্রার্থীদের পক্ষে বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরির বাজারও বেশ খারাপ ছিল।

এই সব কোম্পানিতে চাকরিও পেত মূলত পার্টি কর্মী বা আমলাদের স্বজন-পরিজনরা। এদের ভেন্ডর, ঠিকাদার কে হবে তা ঠিক করত পার্টি। এরা সরকারি ছাপের জন্য ব্যাংক থেকেও সহজে ঋণ পেত, যা অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা পেত না।

পরের ধাপ হলো চিটফান্ড। অটলজী ভারতের অর্থব্যবস্থাকে সচল করতে সুদের হার কমানোর পরে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষকে ঠকাতে এল চিটফান্ড কোম্পানি। সারদা, রোজভ্যালি, অ্যালকেমিস্ট, ভিবজিয়োর, আই কোর, MPS থেকে একের পর এক কোম্পানি বাজার ছেয়ে ফেললো। বামেদের সময় এরা রোজ একটা করে সোনার ডিম পাড়তো, আর বামেরা সেটা ভোগ করতো। তৃণমূল এসে মুরগি একবারে মেরে ফেলায় পুরো এই চিটফান্ড বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়ে। জেলে যায় এঁদের অধিকাংশ মালিক।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আসার পরে কিছু পরিকাঠামো, শিল্প ইত্যাদি আসে। কিন্তু অধিকাংশই অসৎ ব্যবসায়ীদের থেকে। যেমন জর্জ সোরোস, ডাউ কেমিক্যাল। তারপরে টাটাকে আনার সময় জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে ৩৪ বছরের শাসনের অবসান।

কবি সুকান্ত বলেছেন, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। ৩৪ বছরের শিল্প ও বাণিজ্যের সম্পূর্ণ পতন পশ্চিমবঙ্গকে গদ্যময় করে তোলে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা ও উদ্ভাবনী, চলচিত্র, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, যাত্রা, থিয়েটার, কবি গান, লোকগীতি, বাউল, হস্তশিল্প সব শেষ হয়ে যায়। বাঙ্গালি হয় পরিযায়ী শ্রমিক। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয় এই যে এক অগণতান্ত্রিক সরকারকে তাড়াতে আরও বড়ো অগণতান্ত্রিক সরকার তাঁদের জায়গা নেয় এবং পশ্চিমবঙ্গের আরও রসাতলে যাওয়া আজও অব্যাহত। ☐

তৃণমূল সুপ্রিমো কি রাজ্যপাট যুবরাজের হাতে তুলে দিতে চাইছেন?

বিশ্বজিৎ দাস

রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমোর কুর্সি কি চলে যেতে বসেছে? এমন কথাই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ঘুরছে। তার কারণ আরজি কর কাণ্ডে একেবারে ব্যাকফুটে চলে যাওয়া রাজ্যের শাসকদল এমনিতেই জনসমর্থন হারিয়ে ফেলেছে । তাদের মতে, সাধারণ মানুষ একদিকে যেমন আরজি কর কাণ্ডে বিচার চাইছেন, অন্যদিকে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ, এমনকী দেশ ও বিদেশের মাটিতেও এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠেছে।

সূত্রের খবর, রাজ্যের শাসকদলের অন্দরে নব্য গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাচীন গোষ্ঠীর চাপা লড়াই সামান্য হলেও শুরু হয়েছে। সুপ্রিমো চাইছেন এক আর হচ্ছে আর এক। সংবাদমাধ্যম বয়কট করার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে প্রকাশ পেয়েছে যে দলের অন্দরে চলছে সমন্বয় হীনতা চলছে। এদিকে মুখপাত্রদের রাশ টানতে গিয়ে এমন দু'একজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেটা যে কতটা ভুল হয়েছে, তা তিনি ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন। মুখপাত্ররাও এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন দলের ভাবমূর্তিকে পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে। অন্যদিকে আরজি কর নিয়ে মাজী ও সেন দুই ডাক্তারের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইও প্রকাশ্যে এসেছে। এমনকী মুখপাত্রের পদ হারাতে হয়েছে সেনবাবুকে।

রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হওয়ার পর্যায়ে এখন শাসক দল। এটা আরও প্রকট হয়েছে, যখন দলের একজন সাংসদ দলের বিরুদ্ধেই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। সুপ্রিমোর একটি চাল বড়ো ভুল হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের অনেকেই মনে করছেন। সেটা কী? তিনি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে র‍্যালি করেছেন। তিনি নিজে স্বাস্থ্য মন্ত্রী, আবার পুলিশ মন্ত্রী। এখন এই দু'টি দপ্তরের বিরুদ্ধেই সাধারণ মানুষ থেকে জুনিয়র সিনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলনে নেমেছেন। যে নৃশংসতা একটি তরুণী চিকিৎসকের ওপর ঘটেছে, তাও আবার সরকারি কর্মক্ষেত্রে। সেটা সারা ভারতের কেউই মেনে নিতে পারছেন না। এই নৃশংসতা যারা ঘটিয়েছে তাদের চরমতম শাস্তির দাবি জানিয়ে যেমন এই আন্দোলন, সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাও চাইছেন তাঁরা।

রাজ্যের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে রাস্তায় নেমেছে। তারাও এই আন্দোলনে পুরোপুরি সহযোগী হয়েছে। একেবারে কোণঠাসা অবস্থায় এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বেশ কয়েক বছর ধরেই শাসক দলের নীচুতলা থেকে দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত। প্রশাসনিক দুর্নীতি থেকে শিক্ষা, খাদ্য, বাকি ছিল স্বাস্থ্য, সেটাও একেবারে কলুষিত।

শেখ শাজাহান, কালীঘাটের কাকু থেকে আজকের সন্দীপ ঘোষ— সবাই যে যার মতো করে কারোর নির্দেশে বা প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে। নিজেও যেমন আখের গুছিয়ে কেউকেটা হয়ে উঠেছে, তেমনই রাজনৈতিক মহলের মতে এই মানুষগুলিই টাকা সরবরাহের মূল উৎস হিসাবে কাজ করেছে। আজ যখন তারা সিবিআই অথবা ইডির হাতে, তখন রাজ্যের শাসকদলের মাথাদের মনে এই আশঙ্কা দানা বাঁধতে শুরু করেছে, যে যদি তাদের মুখ দিয়ে কোনোভাবে কিছু বেরিয়ে যায়? মানুষ মনে করছে, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে রাজ্যের রাজ্যপাট যুবরাজের হাতে সঁপে দিয়ে বনবাসেও যেতে পারেন নাটুকে সুপ্রিমো। অনেকে আবার মনে করছেন, দলের ভিতরের চাপ এতটাই যে, যুবরাজকে কুর্সি ছেড়ে দিতে হতে পারে বাধ্য হয়েই। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী বছরই হতে পারে বিধানসভা নির্বাচন। পরিস্থিতি সেই দিকেই এগোচ্ছে বলে তাঁদের ধারণা। অনেকে মনে করছেন এমন অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। তবে একাংশের মতে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দিলে সুযোগ পেয়ে যাবে শাসক দল। তারা প্রচার করতে শুরু করবে তাদের জোর করে ফেলে দেওয়া হলো। মানুষকে বোঝাতে অনেকটাই সুবিধা পেয়ে যাবে তারা। সেই সুযোগ কিছুতেই নিতে দিবে না প্রতিপক্ষ দলগুলি।

এদিকে আরজি কর কাণ্ডে যে ভূমিকা নিয়েছে শাসকদল ও প্রশাসনিক কর্তারা, সেখানে পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিও উঠেছে, আবার সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসকদের প্রতিবাদ থামাতে যতরকমভাবে পারা যায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে শাসক পক্ষ। ফলে শাসক দলের প্রতি সাধারণ মানুষের বিতৃষ্ণা চরমে উঠেছে। সেটাও মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছেন। ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে ফৌজদারি আইনের সংশোধনী বিল আনলেন। তিনি নিজেই নাকি একজন আইনজীবী। তার জানা উচিত যে, দেশের আইন মেনেই নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেওয়া হয় যুক্তি তর্কের মাপকাঠিতে মেপে। আর প্রমাণ সাপেক্ষে অপরাধী চিহ্নিত করা হয়। যদি এমন হতো, ফৌজদারি আইনে অপরাধীকে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হতো, তাহলে একদিকে যেমন সংশোধনাগারগুলি ভরে যেত, অন্যদিকে আত্মপক্ষ সঠিকভাবে প্রমাণ না হওয়ার কারণে নিরাপরাধীও শাস্তি পেত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এখন কোনোপ্রকার নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছেন না।

এমতাবস্থায় রাজ্যের অবস্থা এমন দিকে এগোচ্ছে, যেখানে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে সব চাইতে বেশি, যা আগামী কয়েক দশকেও মেরামত করা যাবে না। □

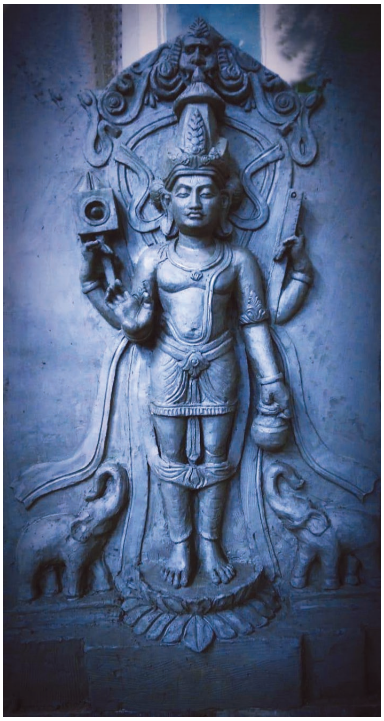

বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিই ভারতীয় শ্রমিক দিবস হিসেবে উপযুক্ত

কল্যাণ গৌতম

রবীন্দ্রনাথের বিরোধী গোষ্ঠী বাস্তবে যে ছিল, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে তিনি নিজেই তার তাত্ত্বিক রূপ সাহিত্য-রসে পরিপূর্ণ করে দিলেন। কবি নিবারণ চক্রবর্তী যেন সেখানে পন্থী-লেখক অথবা কবি, আর অমিত রায় (অমিট) এবং তার বান্ধবীরা রবীন্দ্র বিরোধী গোষ্ঠীর বুদ্ধিমান সমর্থক। সেখানে বিশ্বকর্মার প্রসঙ্গ এসেছে, যেন দেবতা হিসেবে নয়, নিতান্তই এক প্রখ্যাত শ্রমজীবী হিসেবে, 'বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাঁকরা আছে; সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হিরে এবং হিরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আংটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে।' আর এক জায়গায় লেখা হলো, 'ভালোই হলো, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাঁকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।' অর্থাৎ ওই উপন্যাসে রবীন্দ্র-বিরোধী মত হিসেবে বিশ্বকর্মাকে এক 'স্বর্গীয় স্যাঁকরা' হিসাবে তুলে ধরা হলো। 'ধর্ম আফিম', তাই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত কাউকে বামপন্থীরা মানতে নারাজ। কিন্তু 'ধর্ম' বলতে এখানে কেবলমাত্র 'হিন্দুধর্ম'ই পড়তে হবে।

এত বামদলের ভিড়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (বিবেকানন্দবাদী) নামে তো একটাও দল গড়ে ওঠেনি! করেননি তারা। কারণ স্বামীজী হিন্দু। স্বামী বিবেকানন্দ ১ মে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন বটে, তিনি ভারতের শ্রমজীবীদের জন্য চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন বটে, বলেছেন বটে '...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।' তবুও যেহেতু তিনি 'Hindu Monk of India', যেহেতু তিনি হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনীয়া, তাই তিনি বামপন্থীদের আদর্শ নন, হতেও পারবেন না।

বরং পদে পদে স্বামীজীকে অপদস্থ করার জন্য বামপন্থীরা মুখিয়ে ছিলেন, আছেন। একসময় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই লড়েছে বামপন্থীরা। ১ মে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস এলেই নেটিজেনরা তাই বিভ্রান্ত হয়ে যান, 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি!'

অনেকে বলেন, যারা স্বামীজীর ভক্ত, তারা বামপন্থী গ্রুপগুলিতে, বাম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে হিন্দু বিরোধিতা দেখলেও চুপচাপ থাকেন। হিন্দু দেব-দেবীদের অসম্মান করা হলেও 'রা' কাটেন না। 'সর্বংসহা হিন্দু' হয়েই থাকেন। ১ মে নিয়ে পোস্ট দিলেও, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা নিয়ে কথা বললেও, কখনও বলতে শোনা যায় না— স্বামীজীকে সাম্যবাদী সন্ন্যাসী এবং সমাজতান্ত্রিক নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। আসলে বামপন্থীরা বিশ্বাস করেন না সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শনে স্বামীজীর অংশীদারিত্ব আছে; বিশ্বাস করেন না পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদের তিনি অন্যতম দিশারি। তারা কখনও দাবি তোলেননি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (বিবেকানন্দবাদী) নামে একটা বামদল গড়ে উঠুক।

স্বামীজী বলেছেন, দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, কাতর— এরাই দেবতা হোন। বলেছেন, এরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী, এদের প্রণাম। শ্রমিকশ্রেণীর অটল প্রাণশক্তির কথা, অপরিমেয় শারীরিক শক্তির কথা তিনি স্বীকার করেছেন। 'এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে— তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে— তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।' এইরকম কথা যিনি বলতে পারেন এমন আন্তর্জাতিক নেতা একজনকে দেখান দেখি! স্বামীজী নিঃসন্দেহে চিরকালের বিশ্বনেতা। তিনি অধ্যাত্মজগতে দাঁড়িয়েই সামাজিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভারতবর্ষের বামপন্থীরা তা অস্বীকার করলে সমূলে শেষ হয়ে যাবেন। তাই একবার কমরেড, দাবি উঠবে নাকি, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (বিবেকানন্দবাদী)' নামে একটা বামদল গড়ে উঠুক! আচ্ছা স্বামীজী নিয়ে যদি আপত্তি থাকে, তো শ্রীচৈতন্যের নামে একটি সাম্যবাদী দল গড়ে উঠুক, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (চৈতন্যবাদী)।

বামপন্থীরা সব জেনে বুঝে এইরকম দাবি তোলেন না। তারা নিজেরাও জানেন, 'বামেরা একমাত্র হিন্দুধর্মেই প্রবল বিরোধী'। পশ্চিমবঙ্গে তাদের রাজত্ব এবং সাইনবোর্ড চলে গেলেও বামপন্থার আবহ এখনও মস্তিষ্কে বইয়ে রাখতে পেরেছেন তারা। নানান গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিশেষত শিক্ষা ও বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এখনও মস্তিষ্কে বসে আছেন সর্বত্র, নিয়ন্ত্রণ করছেন; রাষ্ট্রবাদী দলেও কেউ কেউ ঘাপটি মেরে চুপ করে বসে আছেন। খেলা হচ্ছে! উপরে অনেকের

ফঃ ৩

সবুজ, নীল, গেরুয়া ইত্যাদি রং দেখা যায় বটে, ভেতরে টকটকে লাল। এরা দক্ষিণপন্থী নীতিনির্ধারণকারী 'সরল' (কেউ কেউ বলেন 'বোকা') নেতাদের সময়ে সময়ে তোয়াজ করতেও ছাড়েন না। কারণ ওইসব পদগুলো তাদের চাই, যেখানে গোপনে বৌদ্ধিক বাম-বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। রাজত্ব নেই তো কী!

ভারতবর্ষের নিজস্ব শ্রমিক দিবস অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পূজা হাজার হাজার বছরের পুরনো। কেবল শ্রমিকরা দিনটিকে পালন করেন, তাই নয়, প্রকৌশলী বা ইঞ্জিনিয়াররাও পালন করেন। ফলে দিনটি ভারতবর্ষে প্রকৌশলী দিবস বা ইঞ্জিনিয়ারর্স ডে-ও বটে। শ্রমের মূল্যায়নে এবং দেব-আরাধনায় শ্রমিক-প্রকৌশলী বিচার ভারতবাসী করেনি। ভারতবর্ষে আলাদাভাবে শ্রমিক দিবস ও প্রকৌশলী দিবসের ধারণা নেই। ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মাকে সমভিব্যাহারে পূজা করাটাই বিধি।

জানা যায়, উনিশ শতকে 'শ্রমজীবী' নিয়ে প্রথম কবিতাটি লিখেছিলেন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব শিবনাথ শাস্ত্রী। স্বদেশি মন্ত্র দিতে শিবনাথ যেমন পুরোধা ছিলেন, শ্রমজীবী মানুষকে তাতে শামিল করার ব্যাপারেও ছিলেন সমান উৎসাহী। শিবনাথের কবিতা ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। সম্পাদক ছিলেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—

'উঠো জাগো শ্রমজীবী ভাই!
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারীনর
ঘুমাবার আর বেলা নাই,
উঠো জাগো ডাকিতেছি তাই।'

সমাজতন্ত্রের আদর্শ ভারতীয় ধারার মধ্যেই লালন করেছিলেন শিবনাথ। এমনকী বঙ্কিম ও বিবেকানন্দেও লালিত হয়েছে। তবুও তাঁরা ভারতীয় বামপন্থীদের কাছে কল্কে পাননি। কারণ তাঁরা শাশ্বত জীবনমূল্যকে অস্বীকার করতে চাননি। শাশ্বত ভাবনাকে অস্বীকার করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী করে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তা বিশ্ববাসী দেখেছেন।

১ মে শ্রমিক দিবস পালন ভারতীয় ঘরানা নয়, এটা ভারতবাসী এখন বুঝতে শুরু করেছেন। শ্রমের দেবতা বিশ্বকর্মা, আর শ্রমিক দিবস হচ্ছে ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূর্জার দিন। 'বিশ্বকর্মা' নামের মধ্যেই আন্তর্জাতিকতার সুবাস। কাজেই দিনটি কেবল ভারত কেন, বিশ্ব শ্রমিক দিবস হবার উপযুক্ত। ভারতে বিশ্বকর্মা পূজার দিনটি সরকারিভাবে শ্রমিক দিবস হোক। পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটিকে মদ-সংস্কৃতি ও অসভ্যতার দিন করে তুলেছিলেন বামপন্থী শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ কনসার্ট। দিনটিকে কলুষিত করেছিলেন। এবার তাদের ক্লোজ করতে হবে। দিনটির মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে।

এই কাজটি মূলত করবেন রাষ্ট্রবাদী শ্রমশক্তি, তার পিছনে সামগ্রিক ঐতিহ্যপন্থীকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্বকর্মা পূজার দিনটি ভারতীয় শ্রমিকেরা কীভাবে পালন করেন? এদিন তারা আপন কর্মোন্নতির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান। কারণ বিশ্বকর্মা নির্মাতা, তিনি কর্মকার। তাদের বিশ্বাস, বিশ্বকর্মা শিল্পের দেবতা, সহস্র শিল্পের আবিষ্কারক। তিনি হাজার শিল্পবিদ্যার অধিকারী। সনাতনী সংস্কৃতিতে বিশ্বকর্মাকে বিশ্বের যাবতীয় স্থাপনার আশীর্বাদক দেবতা বলে মান্যতা দেওয়া হয়। সকল ধর্মের কারিগরী-দেবতা তিনি, সকল যন্ত্রের যন্ত্রী-দেবতা, সকল প্রযুক্তির প্রকাশ-শক্তি। স্থাপত্যবেদের রচয়িতা, সর্বদর্শী ভগবান তিনি। তাঁর চোখ, মুখ, বাহু, পদযুগল সর্বদিক জুড়ে রয়েছে। তাই দিয়েই তিনি ত্রিভুবন নির্মাণ করেছেন। শিল্পকে প্রকাশ করেছেন, অলংকার সৃষ্টি করেছেন, দেবতাদের বিমান, রথ নির্মাণ করেছেন, নির্মাণ করেছেন দেবতাদের সকল অস্ত্র। তিনি দেবতাদের পুষ্পক রথ নির্মাণ করেছেন, করেছেন শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, লক্ষ্মীর কোষাধ্যক্ষ, কুবেরের কুবের পাশ, কার্তিক বল, লঙ্কা নগরী, পঞ্চপাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি এবং শ্রীক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ জগন্নাথের বিগ্রহ নির্মাতা। একজন স্থাপত্য শিল্পী। দ্বারকাপুরী তাঁরই পারদর্শিতায় তৈরি হয়েছে, হয়েছে দ্বারকা-নগরীর বাস্তুবিদ্যার পরিকল্পনা। পৃথিবীর সকল গতির গন্তব্য-সহায়ক দেবতা। তাঁকে বিনম্র প্রণাম করে, স্মরণ-মনন করে কাজে নিয়োজিত হন শ্রমিকেরা। তাঁর আশিস প্রার্থনা করে দুঃসাহসিক নির্মাণ কর্মে ব্রতী হন। কাজেই তাঁর বাৎসরিক আরাধনার দিনটি অর্থাৎ ভাদ্রের সংক্রান্তিটি শ্রমের পূজা, শ্রমিকের স্বীকৃতি আর শ্রমিক-দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনার দিন। তাই বলতে হয়, আপাদমস্তক বামপন্থী-শালুতে মোড়া ১ মে ভারতে শ্রমের পরব হতে পারে না। আমাদের প্রথমে ভারতীয় হতে হবে, ভারতের সীমার মধ্যেই ভারতীয়ত্ব খোঁজ করতে হবে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতিকে মান্যতা দিতে হবে। তারপর দুনিয়ার কমিউনিজমের সুলুকসন্ধান করতে বেরোতে হবে। তাই বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিতে ভারতীয় রীতি মেনে শ্রমের পূজা আর শ্রমিকের পূজা করুন। □

জনজাতি সমাজে নারী

শুভশ্রী দাস

জনজাতি সমাজে মহিলারা পুরুষের সঙ্গী। পুরুষদের তারা সহকর্মী। সমাজ ও পরিবারে তাদের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকে। জনজাতি মহিলারা গ্রাম বা শহরের অন্য সমাজের মহিলাদের মতো পুরুষদের মুখাপেক্ষী থাকে না। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের জন্য তারা তাদের পুত্র বা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নয়। ঈশ্বরের কৃপায় তারা অন্য সমাজের মহিলাদের থেকে শারীরিকভাবে সক্ষম। তারা শুধু ঘরকন্নার কাজ করে না, ছেলে-মেয়ে প্রতিপালন করেও তাদের সারাদিন জমিতে কাজ করতে দেখা যায়। জমিতে ফসল বুনতে, বড় করতে ও ঘরে তুলতে সারা বছরই এদের বড়ো ভূমিকা থাকে। মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার জনজাতি মহিলাদের অধিকার অসীম। ঘরে-বাইরে সমস্ত কাজ তারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের স্বামী প্রতি পদে তাদের অনুগামী থাকে। খুবই পরিশ্রমী ও স্বাভিমানী এই সমাজের মহিলারা।

খেত-খামারের কাজকর্ম থেকে হাটবাজার সব এরাই করে। কোন জমিতে কী চাষ হবে তা ঠিক করে এরাই। পরিবারের জমিজমার পুরো অধিকার মেয়েদের ওপর থাকে। ধানের চারা ওঠানো, কড়া রোদ অথবা মুসলধারে বৃষ্টির মধ্যে রোপণ করা, দেখাশুনা করা এবং ঘরে তোলা সবই মহিলাদের দায়িত্ব। বাজারে বিক্রির দায়িত্বও তাদের। জনজাতি সমাজে এমন কোনো মহিলা পাওয়া যাবে না যে শুধু ঘরের কাজ করে। এই সমাজের স্কুল-কলেজে পড়া মেয়েরাও পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেত-খামারের কাজও সমানভাবে করে।

জনজাতি সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টা গ্রাম-শহরের শিক্ষিত মেয়েদের কল্পনার অতীত। ফসল লাগানোর পর তদারকির জন্য যখন মহিলারা জমিতে ব্যস্ত থাকে তখন পুরুষরা বাড়িতে শিশুদের পরিচর্যায় মনোনিবেশ করে। ঘর মেরামতির কাজ করে। বাড়ির উঠানে বা লাগোয়া জমিতে সবজি, ফল বা লতাপাতার গাছ দেখাশোনা করে। ঘরে বৃদ্ধ বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার প্রতি খেয়াল রাখে। প্রতি পদক্ষেপে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্ত্রী-অস্মিতার অপূর্ব মিশ্রণ জনজাতি সমাজে দেখা যায়। এই সমাজের মহিলারা পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারিণী। তাদের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন যে, তারা নিজের জীবনসঙ্গী নিজেই বেছে নিতে পারে। শুধু তাই নয়, বিয়ের আগেই হবু স্বামীকে বাজিয়ে দেখে নেওয়ার অধিকারও তাদের পূর্ণমাত্রায় থাকে। এই পরম্পরাকে তাদের ভাষায় লমসেনা বলা হয়। এই প্রথায় বিবাহযোগ্য যুবককে যুবতীর বাড়িতে থেকে সমস্ত কাজকর্মে নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত হতে হয়। এই পরীক্ষায় পাশ অথবা ফেল করানোর পুরো অধিকার যুবতীর ওপর থাকে। এই প্রথা এখনও মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড সমাজে পূর্ণ মাত্রায় আছে।

জনজাতি সমাজের মেয়েরা একা থাকতেও ভয় পায় না। ঈশ্বর তাদের শারীরিক শক্তি পুরুষদের থেকে কম দেননি। এই সমাজের মহিলারাও তির-ধনুক, বল্লম, গুলতি ব্যবহারে বেশ

দক্ষ। ধনী জনজাতি পরিবারে তাই ডাকাতি হওয়ার কথা খুব কম শোনা যায়। শিশুকাল থেকেই মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে তির-ধনুক, বর্শা ও গুলতি ব্যবহারের শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে থাকে। সারাদিন মাঠে-ঘাটে-খাদানে হাড়-ভাঙা খাটুনি করেও সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় পুরুষদের সঙ্গে মাদলের তালে তালে তারা পরম্পরাগত নৃত্যগীতে মেতে ওঠে, তখন মনেই হয় না সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হওয়ায় পুরুষরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে না। কোনো জনজাতি দম্পতি ক'টি সন্তানের জনক-জননী হবেন তাও নির্ভর করে স্ত্রীর সম্মতির ওপর। আজ জনজাতি সমাজের অনেক মেয়ে লেখাপড়া শিখে হিল্লি-দিল্লি এমনকী ইংলন্ড, আমেরিকাতেও বসবাস করছে।

আজ নারীশক্তি জাগরণ, নারী সচেনতা বৃদ্ধির জন্য নানা রকমের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ চলছে। কিন্তু লোকচক্ষুর অগোচরে নারী স্বাধীনতার অগ্রদূত এই জনজাতি সমাজের মহিলাদের কথা বড়ো কেউ উল্লেখ করেন না। যদি শহরের মতো সুযোগ-সুবিধা এরা পেত তাহলে এদের মনোবল, উৎসাহ ও শক্তি বাকি নারী সমাজের কাছে অনুকরণীয় হতো— একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়। □

পেশাগত রোগ ও হোমিওচিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

জীবিকার স্বার্থে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকেন এবং সেটাই তাঁর পেশা। যেমন কেউ মাটির তৈরি জিনিস করেন। কেউ লোহা বা কাঠ বা সোনা, রুপা ইত্যাদি দিয়ে জিনিস বানান। কেউ কয়লা খনিতে কাজ করেন। কেউ কেউ মিলে কাজ করেন। কেউ দেশলাই কারখানায় কাজ করেন। কেউ ইট ভাটায়, বালি খাদানে, কেউ আবার বাজি কারখানায়, কেউ ধূপকাঠি বানানোর কাজ করেন। সুন্দরবন অঞ্চলে মাছের মীন ধরার কাজে বিশেষত মহিলারা নিযুক্ত থাকেন।
পশুপালন, ট্রাফিক পুলিশ, রাজমিস্ত্রি ও জোগাড়ে, ব্যাটারি তৈরি, তীব্র শব্দজনিত স্থানে কাজ, প্লাস্টিক কারখানায় কাজ। সিমেন্ট কারখানায় কাজ। বিউটি পার্লারে কাজ। হাসপাতালে টেকনিশিয়ানদের কাজ, শিশু শ্রমিকদের কাজ।

প্রথমেই আসি রোগের কথায় । দেশলাইতে যে দু'টি মূল উপাদান থাকে তা হলো পটাশিয়াম ক্লোরেট ও লাল ফসফরাস। এখানে যারা কাজ করেন ফসফরাসের প্রভাব তাদের জিনগত পরিবর্তন, ক্যানসারও হতে পারে। এখানে বিষাক্ত ফনফিন গ্যাসও থাকতে পারে। এই গ্যাস ফুসফুসের জন্য অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। বাজি কারখানাতেও একই সমস্যা রয়েছে। ভিন্ন রাসায়নিকের মিলন হবার ফলে বিস্ফোরণ, প্রাণহানি এইসব তো রোজকার ঘটনা। বাজিতে রং আনার জন্য ব্যবহার হয় বেরিয়াম সল্ট। এটি খুবই বিষাক্ত, যা ফুসফুস, হৃৎপিণ্ডের প্রভূত ক্ষতি করে। ধূপকাঠি তৈরিতে ব্যবহৃত বেঞ্জিনের মতো বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে ফুসফুসের একরকম রোগ হয় যার নাম হাইপোরসেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস। এটি ধীরে ধীরে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

কয়েকটি শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ফুফুসের রোগ হয়। যেমন কফি, তামাক, মাশরুম, পাউরুটি তৈরির কারখানার শ্রমিকদেরও এটি হতে পারে। চিড়িয়াখানায় পশুপাখির পরিচর্যায় অনেক সময় পশুপাখির কামড় বা অন্যভাবে তাদের আক্রমণের শিকার হয়ে ব্যাকটেরিয়া ঘটিত নানা রোগ হতে পারে। কৃষিকাজে কীটনাশক স্প্রে করার সময় মুখ ও ত্বকের মাধ্যমে নানারকম রোগ হতে পারে। তাই মাস্ক আর গ্লাভস ব্যবহার করা উচিত। একটানা দীর্ঘক্ষণ রোদে কাজ করা শ্রমিকদের হিটস্ট্রোক হতে পারে। ব্যাটারি কারখানায় শ্রমিকদের ক্যাডমিয়াম ধাতু নিয়ে কাজ করতে হয়। এর গুঁড়ো নাকে ঢুকলে ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে। প্লাস্টিক শিল্প, অ্যাসবেসটেস নিয়ে কাজ করা শ্রমিকদেরও ক্যানসারের সম্ভাবনা রয়েছে। খনি শ্রমিকদেরও ফুসফুসে ক্যানসার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। দমকল কর্মীদেরও ফুসফুসের সংক্রমণের থাকেই।

এরপর আসি বিউটিশিয়ানদের কথায়। ক্লায়েন্টদের সুন্দর করে তুলতে তাদের হাতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শ হয়। যার ফলে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

যারা অফিসে কম্পিউটারে কাজ করেন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে থাকতে কোমর, ঘাড়ের অসহ্য ব্যথা হয়। শারীরিক ব্যায়াম না হওয়ার জন্য গ্যাস, অম্বল, মাথা যন্ত্রণা, সুগার ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

হাসপাতালে কর্মরত স্টাফদের বিভিন্ন রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রোগীদের বাঁচাতে হয়, সাবধানতার অভাবে রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এক্ষেত্রে কারণ, লক্ষণ ও প্রয়োজন মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক। □

বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্মা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গণ্ডিতে বন্দি বিরাট :

এক থেকে বহু, নাকি বহুর সমন্বয়ে এক— ভারত দর্শনের এ এক জটিল জিজ্ঞাসা। ভারত-ঋষির উপলব্ধি,— একংসদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি— তিনি এক, জ্ঞানীগণ তাঁকে বহুভাবে প্রকাশ করেন। ভক্তমনোরঞ্জনেই তাঁর এই নানা রূপে প্রকাশ। বহু বর্ণে, বহু রশ্মিতে প্রকাশমান তিনিই সূর্যসম একই জ্যোতিষ্কে অবস্থিত।

ভারত-দর্শন, মনন ও চিন্তনের এই বৈচিত্র্যই নানা বিচ্ছুরিত ভারতের ধর্মসাধনায়। সেই সাধনারই এক অভিনব উদ্ভাস বিশ্বকর্মার রূপ কল্পনায়, তাঁর আরাধনায়। সেই বৈদিক যুগ থেকে তিনি আধারিত। কিন্তু বেদ থেকে পুরাণের যুগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে সেই রূপ- কল্পনায় নানা ভিন্ন রঙের প্রক্ষেপ। আর সে কারণেই বিশ্বকর্মা ভারত ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বিরাজিত, বিবর্ধিত সুদূর থেকে ঘরের আঙিনায় পরম আপনজন হিসেবে।

দূরের সূর্য কখনও বিম্বিত সামান্য একবাটি জলে। বন্দি সূর্য তখন যেন হাতের নাগালে। সেই বাটি সরিয়ে নিলেই সূর্য দেদীপ্যমান দৃঢ় গগনে সেই আগের মতোই। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার ক্ষেত্রেও ঘটেছে তেমনই বিবর্তন। এমনই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জনয়িত্রী— নির্মাতা— তিনিই এখন বর্ষাশেষে পূজিত কলকারখানার দেবতা হিসেবে। বিরাটত্বের অবসানে এখন বিশ্বকর্মা যেন ওই ছোটো বাটি বন্দি সূর্যেরই মতো।

সাধনার এক আরোহী রূপ :

'বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সন্দৃক' (ঋগ্বেদ ১০।৮২।২)— বিশ্বকর্মা তিনি বৃহৎমনা-অর্থাৎ বিরাট তাঁর মন, তিনি বিরাট— তিনিই নির্মাতা, নির্মাণ করেন, ধারণ করেনও তিনিই। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বদ্রষ্টা তিনি দেখছেন সবকিছুই। সপ্তঋষির পরবর্তী যে স্থান সেখানেই তাঁর অবস্থান। তিনি একা, একথাই বলেন দিব্যদ্রষ্টারা। তিনি জন্মদাতা পিতা। তিনি বিধাতা, বিশ্বভুবনের সব কিছুই তিনি জানেন। তিনি— এক— একমাত্র তিনিই নিয়েছেন সব দেবতার নাম। অর্থাৎ এক থেকেই সৃষ্টি বহুর।

বেদের সেই এক— একমাত্র স্রষ্টাই পুরাণমন্ত্রে পূজিত— দংশপানাঃ মহাবীরঃ সুচিত্রঃ কর্মকারকঃ বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃকতঞ্চ বাসনামাগে দণ্ডধৃক— রূপে।

বেদের সময় থেকে পুরাণের সরণি ধরে বর্তমানের পটে বিশ্বকর্মার এই রূপান্তরে মনে হতে পারে বেদের দেবতা তার গৌরব হারিয়ে এখন বোধহয় লোকায়ত বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিতরা মনে করেন, এটাই স্বাভাবিক। ভারতজনের মানসিকতার এটাই বৈশিষ্ট্য। দূরের দেবতাকে ঘরের সন্তান অথবা আপনজনের আসনে বসিয়ে প্রতিদিনের সব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়াটাই ভারতধর্মের এক আশ্চর্য সাধনা। সাধনার সেই ধারাতেই এই বিশ্বের স্রষ্টা বিশ্বকর্মা আজ নিত্যদিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলির সাধারণ প্রতীক হিসেবে ভয় নয়। ভালোবাসার আসনে উপবিষ্ট। অবনমন নয়, এটাই ভারতধর্মের এক আরোহী ধারা অসাধারণে

সংশ্লিষ্ট হওয়ার এটাই চরম সাধনা ।

বেদে বিশ্বকর্মার স্তুতি :

এ যেন শূন্য থেকে শুরু। সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে— যখন না-ছিল আকাশ, না-ছিল পৃথিবী, না-ছিল জীবন, না-ছিল মরণ; চারিদিক ছিল কেবল ঘন অন্ধকার। সব কিছু ছিল জলময়। আর তারই মধ্যে একমাত্র তিনি ছিলেন বিরাজিত।

সেই তিনি বসলেন সৃষ্টিতে। যা আভাসিত হয়েছিল অন্তরে— তাকেই বাস্তব রূপ দিতে শুরু করলেন তিনি। প্রথমেই জলের সঙ্গে জল জুড়ে তা দিয়ে সৃষ্টি করলেন দ্যাবা-পৃথিবী। যখন এই দ্যাবাপৃথিবীর চারদিকের সীমা ক্রমশ দূর-বিস্তৃত হলো— তখনই পৃথক হলো ভূলোক-দ্যুলোক।

বিশ্বকর্মা তিনি— স্রষ্টা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের। তিনিই পিতা— জন্মদাতা—বিশ্ববিধাতা, তাঁর অজানা নেই কিছুই। তিনি বিশ্বকর্মা,— বিশ্বদর্শনকারী দেবতা— তিনি ঠিক কোনখান থেকে, কীভাবে এই বিশ্বনির্মাণ করেন— তা কেউ জানেন না। সে এক পরম জিজ্ঞাসা! এটুকুই শুধু জানা, এই পৃথিবী সৃষ্টির পর তাকে আবৃত করেছিলেন তিনি আকাশ দিয়ে।

তিনি পিতা। তিনি প্রভু। সমস্ত দিকে তাঁর চোখ অর্থাৎ তাঁর অদেখা কিছু নেই। তাঁর চোখ জড়িয়ে কিছু করাও সম্ভব নয় কোনো মতে। সমস্ত দিকে চোখের মতোই চতুর্দিকে তাঁর মুখ। সমস্ত দিকে তাঁর হাত-পা। দু-হাতে সব কিছু সঞ্চালন করে তিনি নির্মাণ করেন সবকিছু।

তিনি বিশ্বকর্মা। নিজে যজ্ঞ করে তিনি নিজেই দেহ ও শরীরকে পুষ্ট করেন। তিনি বাচস্পতি অর্থাৎ তিনিই সব বাক্য বা কথার অধিপতি। তাতেই নিবিষ্ট থাকে মন। সর্ব কল্যাণের উৎস বিশ্বকর্মার সব কাজের মধ্যেই রয়েছে চারুতা— আছে চমক। এভাবেই ঋগ্বেদে (১০।৮১-৮২) উদ্‌জাত বিশ্বকর্মার কীতিকথা।

ত্বষ্টা এবং বিশ্বকর্মা :

বিশ্বকর্মা বিশ্বনির্মাতা। ঋগ্বেদের এই সম্পর্ক ঘোষণার পাশাপাশি রয়েছে আরও এমন কিছু সূক্ত যেখানে তিনি বন্দিত ভিন্ন নামে। নাম ভিন্ন হলেও তিনিই যে ওই একই বিশ্ববিধাতা বিশ্বকর্মা তা কিন্তু বোঝা যায় তাঁর কীর্তি-কথার প্রতিটি শব্দে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে তিনি আখ্যাত হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি হিসেবে। বলা হয়েছে, সৃষ্টির সেই আদিম চরমমুহূর্তে একমাত্র হিরণ্যগর্ভেরই ছিল অস্তিত্ব। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হন সব কিছুর অধিপতি। তিনিই আকাশ এবং পৃথিবীকে তাদের নিজের নিজের জায়গায় সংস্থাপিত করেন। তাদের দৃঢ়বদ্ধ করেন। তারই ফলে আকাশ ও পৃথিবী কোনো সময়ই বিচ্যুত হয় না নিজের নিজের জায়গা থেকে। তিনিই স্বর্গ ও মর্ত্যকে একইসঙ্গে স্তম্ভিত ও উল্লসিত করেন। জলের মধ্যে অগ্নি সৃষ্টি করে তিনি করেন জীবনের উদ্বোধন। এই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভই বিশ্বকর্মা— বিশ্বধাতা— একমাত্র তিনিই উৎপন্ন সবকিছুকে আয়ত্তে রেখেছেন— অন্য কেউ নয়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩, ৮ ও ১০ সূক্তে যে ত্বষ্টার উল্লেখ রয়েছে— ভাষ্যকাররা তাঁকেই বিশ্বকর্মা বলে উল্লেখ করেছেন। ওইসব সূক্ত থেকে জানা যায়। তস্থা হলেন সব শিল্পকর্মের দেবতা। ইন্দ্রের বজ্র, বৃহস্পতির কুঠার এবং দিব্য খাদ্য ও পানীয়ের সব পাত্র নির্মাতা। তাঁকেই বিশ্বপিতা বলা হয়। কন্যা সারণ্যুর কারণে তিনি মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবেও কথিত। তিনি বৃহস্পতি ও ইন্দ্রেরও পিতা। ত্বষ্টাই দেবভোগ্য সোমের রক্ষাকর্তা। তাঁর অন্য সন্তান বিশ্বরূপ ছিলেন গো-রক্ষক। অতিরিক্ত সোম অপহরণ করে তা পান করেন। ইন্দ্র ত্বষ্টা-পুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করে তাঁর গাভীগুলি হরণ করেন। যাইহোক, শিল্পকর্মের দেবতা এই ত্বষ্টার স্থান পরবর্তীকালে নেন, বলা যায় বিলোপ ঘটে ত্বষ্টার কালের প্রভাবে।

সূর্য ও বিশ্বকর্মা—দুইরূপে এককর্মা :

ঋগ্বেদে বিশ্বকর্মা বিশ্বাত্মা। তিনি স্বয়ম্ভূ। শুক্ল যজুর্বেদে ওই বিরাট পুরুষের অভিধা 'দক্ষিণা'। দক্ষিণ শব্দের অর্থ প্রসন্ন। সেই অর্থে যিনি প্রসন্ন থাকেন তিনিই বিশ্বকর্মা। মহীধরের ভাষ্যমতে, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি করেন বলেই তিনি বায়ু। সে বায়ু প্রবাহিত হয় আর্যাবর্তের দক্ষিণ দিক থেকে। তাই তিনি দক্ষিণা।

বৈদিক সাহিত্যে নানা সময় একীভূত হয়েছে বিশ্বকর্মা ও সূর্য। এই একীভূত হওয়ার মূল কারণ— দৃশ্যত সূর্যই তো সৃষ্টিকর্তা। তাই তো বেছে বলা হচ্ছে,— 'হে সূর্য, তুমি দ্যুতিময়। জ্যোতির মাধ্যমে শোভামান তুমি। সেই রূপেই প্রকাশিত হও দ্যুলোকে। তুমিই সমস্ত কর্মসম্পাদক। তাই তো তুমি বিশ্বকর্মা। তোমারই তেজে তো এ বিশ্বভুবন অধিষ্ঠিত।'

ভিন্ন নামে অভিহিত হলেও ঋগ্বেদে অনেক জায়গাতেই সূর্য ও বিশ্বকর্মা যে রূপে বর্ণিত হয়েছে, তাতে মনে হয় তাঁরা দু'জনেই এক ও অভিন্ন। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়, ঋগ্বেদেরই বিভিন্ন উক্তির। দশম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে বলা হয়েছে 'একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি'— সেই এক সৎ-কে ঋষিরা বহুরূপে দেখেছেন ও ভজনা করেছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তেরও স্বীকৃতি, সেই শাশ্বত সত্তাকে ঋষিরা অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা ইত্যাদি নানা নামে আখ্যাত করেছেন। আর এসব থেকেই বলা হয় বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মা এবং 'প্রসবীতা জনানাং' সূর্য একই মুদ্রার দুই পিঠ— তাঁরা নামে ভিন্ন, রূপ ও কর্মে অভিন্ন।

একই গুণের আধার এই দুই দেবতা পৌরাণিকে এসে হয়েছেন একীভূত— দুইয়ে মিলে এক। সূর্য ও বিশ্বকর্মা সব অর্থেই জগৎস্রষ্টা এবং জগৎপালকও।

নানা নামে বিশ্বকর্মা :

বিশ্বকর্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। তিনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। এমনটাই বলা হয়েছে

ঋগ্বেদের বিশ্বকর্মা সূক্তে, কৃষ্ণ যজুর্বেদের পুরুষসূক্তে এবং আরও নানা জায়গায়।

কিন্তু পৌরাণিক যুগে ঘটেছে বিশ্বকর্মার নানা রূপ রূপান্তর। পুরাণগুলিতে কম করে পাঁচজন বিশ্বকর্মার উল্লেখ রয়েছে। যেমন— বিরাট বিশ্বকর্মা— যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা।

ধর্মবংশী বিশ্বকর্মা— যিনি মহান স্থাপত্যবিদ এবং ধর্মের পুত্র। আবার অন্যত্র তিনি বাস্তুদেব এবং অঙ্গিরাশির পুত্র।

অঙ্গি বিশ্বকর্মা— প্রথম বিজ্ঞানী।

সুধন্ব বিশ্বকর্মা— মহান স্থাপত্যবিদ।

ভৃগুবংশী বিশ্বকর্মা— বাবা ভৃগু এবং মা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কন্যা দিব্যা। দৈত্যপুরীতেই তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁর ভাই ও গুরু।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, (৩।৩), শিবসংকল্প উপনিষদ এবং অথর্বশিরোপনিষদ অনুযায়ী বিশ্বকর্মাই বিশ্বেশ্বর মহাদেব। একমাত্র বিশ্বকর্মা মন্ত্রেই রুদ্রের পূজা করা হয়।

মূলস্তম্ভ পুরাণ মতে, বিশ্বকর্মা নিজেই নিজের স্রষ্টা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু- মহাদেবেরও আগে তাঁর উদ্ভব। এই পুরাণের কথায়, মাঘের শুক্লা ত্রয়োদশীতে আবির্ভূত হন বিশ্বকর্মা।

পৌরাণিক বিশ্বকর্মার আগে রয়েছে বেদের দেবতা বিশ্বকর্মার অবস্থান। সর্বশক্তিমান ভগবান বিশ্বকর্মা তাঁর হাত ও পা দিয়ে স্বর্গ ও মর্ত্য তৈরি করেন। সমস্ত সৃষ্টিশক্তির রূপক নামধারী বিশ্বকর্মার রয়েছে নানা নাম। যেমন, ধাতা, বিশ্বস্রষ্টা, প্রজাপতি, পিতা, সর্বজ্ঞ, বাচস্পতি, মনোজব, বদান্য কল্যাণবর্মা ইত্যাদি। ত্বষ্টার কর্মশক্তি আত্মসাৎ করায় তাঁর আরেক নাম ত্বষ্টা।

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মাই দেবতাদের নামকরণ করেছেন। তিনি করেছিলেন সর্বমেধযজ্ঞ। সেই যজ্ঞে তিনি নিজের কাছে নিজেকেই বলি দেন। এই দেবতা বিশ্বকর্মা মর্ত্যজীবের কাছে অনধিগম্য।

উদ্ভব কাহিনি :

বেদে যিনি স্বস্রষ্টা— পুরাণে তাঁরই উদ্ভব সম্পর্কে রয়েছে নানা কাহিনি। একটি কাহিনির সারকথা, ক্ষীর সমুদ্রে অনন্তশয়ানে

শায়িত বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে উদ্ভব হয় ব্রহ্মার। ব্রহ্মা চতুর্মুখ। বাহন তাঁর হংস। ব্রহ্মাকে বলা হয় সৃষ্টির আদি দেবতা।

ব্রহ্মার সপ্তম সন্তান বাস্তুদেব। জন্ম তাঁর বাস্তুর গর্ভে। বাস্তুদেব বিয়ে করেন অঙ্গিরাশিকে। তাঁদেরই সন্তান ঋষি বিশ্বকর্মা। পিতার মতোই বিশ্বকর্মাও ছিলেন স্থাপত্যবিদ্যায় পারঙ্গম। তিনি রচনা করেন স্থাপত্যবেদ নামে একটি উপবেদের।

নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণগুলিতে অবশ্য বিশ্বকর্মারও পিতার নাম ভুবন। অন্যদিকে মহাভারত ও হরিবংশের বয়ান, বিশ্বকর্মা হলেন বসুপ্রভাস ও বৃহস্পতির বোন বরস্ত্রী বা যোগসিদ্ধার সন্তান। বিশ্বকর্মার স্ত্রী অপ্সরা ঘৃতাচী। তিন মেয়ে ও পাঁচ ছেলের পিতা তিনি। মেয়েদের নাম বর্হিষ্বতী, সংজ্ঞা ও চিত্রাঙ্গদা। কোনো কোনো পুরাণে অবশ্য সুরূপা নামে তাঁর আরও একটি মেয়ের নাম পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মার পাঁচ ছেলের নাম যথাক্রমে নল (বানর), অজৈকপাত (পৃথিবীর সমস্ত সোনার

অধিপতি), অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা ও রুদ্র।

বিশ্বকর্মা পুরাণ মতে, আদি নারায়ণ সৃষ্টিতে বসে প্রথমে ব্রহ্মা এবং পরে বিশ্বকর্মাকে সৃষ্টি করেন। বরাহ পুরাণের নির্দেশ, বিশ্বকর্মার সৃষ্টিকর্তা হলেন ভগবান ব্রহ্মা। বিশ্বকর্মার উদ্ভব সম্পর্কে পুরাণে আরও একটি কাহিনির সন্ধান পাওয়া যায়। ওই কাহিনি অনুসারে সমুদ্রমন্থনের সময় উদ্ভূত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে ছিলেন বিশ্বকর্মা।

কখনও বৃদ্ধ, কখনও যুবা :

বিশ্বকর্মা হিন্দুর দেবতা। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ, নেপাল ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্বকর্মা পূজিত হন শিল্প ও সৃষ্টির দেবতা হিসেবে। তবে বঙ্গদেশ তথা পূর্ব ভারতে বিশ্বকর্মার যে মূর্তি দেখা যায়, তার সঙ্গে উত্তর ও পশ্চিমভারতে পূজিত মূর্তির রয়েছে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে পূজিত বিশ্বকর্মা রীতিমতো বৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ। তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর সাদা দাড়িতে ঢাকা। বাহন হংস। স্বর্ণসিংহাসনে আসীন দেবতার পাশে দেখা যায় তাঁর পুত্রদের। বিশ্বকর্মার এই মূর্তি প্রতিমুহূর্তে মনে করিয়ে দেয় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে। আর তা থেকে অনেকের অনুমান, ব্রহ্মাই পরবর্তীকালে বিশ্বকর্মা হিসেবে পূজিত হচ্ছেন।

বিশ্বকর্মার এই মূর্তির সঙ্গে বঙ্গদেশ ও পূর্ব ভারতে পূজিত বিশ্বকর্মা প্রতিমার কোনো মিল নেই। এইসব অঞ্চলে দেখা যায় সুঠাম যুবা পুরুষের প্রতিমা। প্রতিমার মুখে দাড়ি নেই, পরিবর্তে আছে শৌখিন কালো গোঁফ। এখানে তার বাহন হাতি। মূর্তির সঙ্গে দেখা যায় না তাঁর ছেলেদেরও।

প্রতিমার রূপ পরিকল্পনায় এই পার্থক্য থাকলেও সর্বত্রই প্রতিমার চারটি হাত। হাতে রয়েছে দাড়িপাল্লা, হাতুড়ি, কমণ্ডলু অথবা বই। শাস্ত্রবিদদের অভিমত, দাড়িপাল্লার দুটি পাল্লা হলো জ্ঞান ও কর্মের এবং হাতুড়ি হলো শিল্পকর্ম নির্মাণের প্রতীক।

বিশ্বকর্মা মূর্তির এই রূপায়ণ দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বৃহস্পতির বৈশিষ্ট্য নিয়েই বিশ্বকর্মা মূর্তি নির্মিত হয়। মূর্তির বাহন পরিকল্পনাতেও আভাস পাওয়া যায় ওই সমন্বয়েরই।

বিশ্বকর্মার নানা মূর্তি :

মানব অন্তর দেবমন্দির। দেবতার বাস মানুষের হৃদয়ে। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার এ এক শাশ্বত সত্য। পরমবিশ্বাস, সেই বিশ্বাস ও উপলব্ধিরই আশ্চর্য প্রকাশ হিন্দুর প্রতিমা কল্পনায়। মানব-অবয়বে দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণ তাই কোনো আশ্চর্য বা অবাস্তব কল্পনা নয়। সে কারণেই দেবতা বা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বা নানা গুণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েও মানুষের স্বাভাবিক কলেবরে প্রতিমা নির্মাণ প্রায় আবহমান কালের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। বিশ্বকর্মার প্রতিমা কল্পনাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

চতুর্ভুজ বিশ্বকর্মা স্বাভাবিক মানবিক অবয়বেই পূজিত হন। অবশ্য বিভিন্ন পুরাণে বিশ্বকর্মার যেসব মূর্তির কথা বলা হয়েছে তাতে রয়েছে নানা ঐশ্বর্যের প্রকাশ। যেমন বশিষ্ঠ উপপুরাণে আছে, বিশ্বকর্মা হলেন পঞ্চানন। পাঁচটি মুখ তাঁর। হাতের সংখ্যাও দশ। ওই পুরাণমতে, বিশ্বকর্মার পঞ্চমুখের নাম হলো, — সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। বিশ্বকর্মার এই পঞ্চমুখ থেকে সৃষ্টি হয় পাঁচজন প্রজাপতি— মনু, ময়, ত্বোস্তা, শিল্পী ও বিশ্বজন। এঁরা আবার পাঁচটি গোত্রের ঋষি। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪।৩।৩) মতে অবশ্য বিশ্বকর্মার পঞ্চমুখ থেকে উদ্ভূত ঋষিদের নাম যথাক্রমে সনাতন, সনক, সুপর্ণ, অনুভবন ও পার্থ।

এইভাবে বিভিন্ন পুরাণের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বিশ্বকর্মার যে মূর্তির পূজা করা হয়, তা ছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের মূর্তি রয়েছে। তবে সেগুলির কথা কেবল পুরাণেই আছে, বাস্তবে সে ধরনের মূর্তি প্রায় দেখাই যায় না।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা :

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মা। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রচলিত পরিচয় তিনি দেবশিল্পী। দেবতাদের তিনি সাজিয়েছেন নানা বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রে। তিনি বিষ্ণুর জন্য তৈরি করেন সুদর্শন চক্র ও শার্ঙ্গধনু। শিবের ধনুক পিনাক, তাও তাঁরই তৈরি। ইন্দ্রের বজ্র নির্মাতাও তিনি। তিনিই নির্মাণ করেন কুবেরের অলকাপুরী, পুষ্পক রথ, কৃষ্ণের দ্বারকানগরী, রাবণের স্বর্ণলঙ্কা, পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর। আবার তাঁরই সৃষ্টি শিবের লিঙ্গমূর্তি।

বিশ্বকর্মা দেবতাদের জন্য নির্মাণ করেন যেসব মহাস্ত্র তাঁর বেশির ভাগেরই মূল উপকরণ সূর্যের খণ্ডিত অংশ বা জ্যোতি। সে এক কাহিনি।

বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা। বিয়ে হয় তাঁর সূর্যের সঙ্গে। কিন্তু সূর্যের ওই প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা চলে আসেন পিতৃগৃহে। কিন্তু বিশ্বকর্মা মেয়েকে বলেন,

বিয়ের পর পতিগৃহই মেয়েদের নিজের বাড়ি। তাই ফিরে যেতে হলো তাঁকে সূর্যভবনেই।

সংজ্ঞা কিন্তু বাবার কথামতো সূর্যালয় যান না। মেরুদেশে এক ঘোটকী রূপে তিনি বিচরণ করতে থাকেন একাই। সূর্যও খুঁজতে খুঁজতে সেখানেই হাজির ঘোটকরূপে। মিলিত হন ঘোটকী সংজ্ঞার সঙ্গে। তারই ফল অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

এরপর সূর্য হাজির হন বিশ্বকর্মার কাছে। বলেন, তাঁর অতিরিক্ত তেজ কমিয়ে দিতে। সে কথায় বিশ্বকর্মা তাঁর ভ্রমি যন্ত্রের ওপর বসান সূর্যকে। ছেঁটে ফেলেন তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশ। তারই ফলে সূর্যের তাপ হয় সহনীয়। সংজ্ঞাও সংসার করতে থাকেন সুখেই।

সূর্যের ওই খণ্ডিত দেহাংশ যেমন তেজোময় তেমনই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেগুলি দিয়েই বিশ্বকর্মা দেবতাদের জন্য তৈরি করেন নানা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। সেসব অস্ত্রের বলেই দেবতারা যুগে যুগে হয়ে ওঠেন অধর্মের সংহারক এবং দুষ্কৃতীর দমনকারী।

শিবলিঙ্গ নির্মাতা :

এক সময় শিবমূর্তি গড়তে বসেছিলেন বিশ্বকর্মা। মূর্তি তৈরির জন্য তিনি বেশ বড়ো দেখে একটি নলের মতো গোল পাথর নিয়ে বসেন। মূর্তি তৈরির জন্য হাতুড়ি ছেনি দিয়ে পাথর কাটার কাজ শুরুর মুহূর্তে তাঁর মনে হলো অমন বিরাট পুরুষকে কোনো মূর্তির আধারে বদ্ধ করা উচিত হবে না। আর তাই তিনি মূর্তি তৈরি থেকে বিরত হন। তারপর ওই গোলাকার পাথরটিকে একটি গামলার মতো পাত্রে স্থাপন করেন। বলেন, এটি হলো শিবলিঙ্গ। এই মূর্তিতেই পূজা হবে শিবের। কিংবদন্তি, এরপর থেকেই শুরু শিবলিঙ্গে শিবার্চনা।

পুরীর জগন্নাথ :

শিবলিঙ্গের মতোই পুরীর দারুব্রহ্ম জগন্নাথ মূর্তিরও স্রষ্টা বিশ্বকর্মাই। সমুদ্রে ভেসে আসা নিমকাঠ নিয়ে বদ্ধ ঘরে শুরু করেছিলেন তিনি মূর্তি নির্মাণ। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে শর্ত দিয়েছিলেন, মূর্তি নির্মাণ করে তাঁর বেরিয়ে আসার আগে যদি কেউ দরজা খোলে তাহলে সেই অবস্থাতেই মূর্তি রেখে তিনি চলে যাবেন।

শর্ত অনুযায়ী চলছিল সব। কিন্তু কিছুদিন পর রাজা কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে সেই ঘরের দরজা খোলেন। মূর্তির তখনও হাত-পা গড়া শেষ হয়নি। শর্তভঙ্গ করায় বিশ্বকর্মা সেই মুহূর্তে অন্তর্হিত হন। আর সে কারণেই পুরীর মন্দিরে পূজা করা হয় ওই অর্ধসমাপ্ত মূর্তিতেই।

এমনই সব অলৌকিক নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বকর্মার নাম। যেমন কথিত আছে, বিহারের ঔরঙ্গাবাদের দেও-তে বিখ্যাত সূর্যমন্দিরটি রাতারাতি তৈরি করে দিয়েছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা পূজা তিথিনির্ভর নয় :

বিশ্বকর্মা পূজা হয় ভাদ্র সংক্রান্তির দিন। প্রায় সারা ভারতেই। হিন্দুর পূজা-অর্চনা মূলত তিথি নির্ভর। অর্থাৎ চান্দ্রমাসের গণনা অনুযায়ী ঠিক হয় পূজার দিন। সে কারণেই বাঙ্গালির জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে হয় না। কিন্তু বিশ্বকর্মা, কার্তিকের মতো কয়েকটি পূজা হয় সৌরগণনা অনুযায়ী। তাই এদের পূজার একটি নির্দিষ্ট দিন রয়েছে। ভাদ্রের শেষে সূর্য সিংহরাশি থেকে কন্যারাশিতে সঞ্চারিত হওয়ার দিনে হয় বিশ্বকর্মাপূজা। সারা ভারতেই। অবশ্য ব্যতিক্রম হিসেবে কোথাও কোথাও দেওয়ালির পরের দিন বা মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতেও হয় বিশ্বকর্মা পূজা— বিশ্বকর্মাজয়ন্তী নামে।

বিশ্বকর্মার পূজা এখন মূলত কলকারখানার মতো কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পূজার রূপান্তরিত হয়েছে। আগে অবশ্য তেমনটা ছিল না। শরতের প্রাক্কালে নির্মল আকাশে নানারকম ঘুড়ি ওড়ানো বিশ্বকর্মা পূজায় অন্যতম অনুষঙ্গ। এই উপলক্ষ্যে নানা জায়গায় হয় ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতাও।

রান্নাপূজা :

পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চলে বিশ্বকর্মা পূজার সঙ্গেই মিশে গেছে মনসাপূজা এবং অরন্ধন বা রান্নাপূজা। সংস্কার অনুযায়ী ভাদ্র সংক্রান্তিতে হয় মনসাদেবী ও অষ্টনাগের পূজা। ওইদিন হয় অরন্ধন। আগের রাতে বিশেষভাবে রান্না খাবার ও পান্তাভাত দেবী মনসাকে সংক্রান্তির দিন উৎসর্গ করে তা খাওয়া হয়। একে 'ভাদ্রে রেধে আশ্বিনে খাওয়ার উৎসব'ও বলা হয়। ভাদ্র সংক্রান্তি ছাড়া সরস্বতী পূজার পরদিন শীতলষষ্ঠীর দিনটিও অরন্ধন হিসেবে পালন করা হয়। স্থানীয় লোকাচারে একে 'গোটাসেদ্ধ' খাওয়ার দিনও বলা হয়।

পুনশ্চ :

বর্তমানে বঙ্গদেশে বিশ্বকর্মা পূজা থেকেই বাজতে শুরু করে শারদীয়া দুর্গাপূজার ঢাক। প্রসঙ্গত, ২০২৩-এর বিশ্বকর্মা পূজার দিন থেকে চালু প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা এই দিনটিকে দিয়েছেন বিশেষ মাত্রা। ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার প্রকল্পটি সাড়া জাগিয়েছে দেশে। সেই সঙ্গে বেড়েছে বিশ্বকর্মা পূজার মাধুর্য এবং গুরুত্বও। ■

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস আয়োজিত মাসিক সংস্কৃতি সন্ধ্যা 'নমামি ভারতবর্ষম্'

গত ৩১ আগস্ট, শনিবার সন্ধ্যায় 'ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যাস' আয়োজিত 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ' নিবেদিত 'নমামি ভারতবর্ষম্' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মানিকতলাস্থিত 'কলা স্যন্দন' সভাগৃহে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় দক্ষিণ এশীয় লাঠি টুর্নামেন্টে দু'টি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক বিজয়ী লাঠি খেলোয়াড় শ্রীজিৎ পাল। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের অন্যতম সহ সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু, প্রান্ত সমিতির অন্যতম সদস্যা মেহেন্দি চক্রবর্তী। প্রান্তের অন্যতম সম্পাদিকা মহাশ্বেতা চক্রবর্তী প্রাক্‌কথন পরিবেশন করেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর সম্মাননীয় অতিথিদের চন্দনের টিপ ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অধ্যাপিকা ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্যে বলেন, হিন্দুদর্শন আমাদের শেখায় যে, মানুষ পরমশক্তি থেকেই সৃষ্ট, মানুষ অমৃতের সন্তান, নিজে বাঁচবে এবং সকলকে বাঁচাবে। এই চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পরবর্তী প্রজন্মকে হিন্দুদর্শনের শিক্ষা দিতে হবে। খেলোয়াড় শ্রীজিৎ পাল বলেন লাঠি খেলা ভারতের তথা সারা বিশ্বের আদি আয়ুধ বা প্রথম অস্ত্র। যে কোনো অস্ত্র অভ্যাসের আগে সেই আদিকাল থেকে মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে লাঠির ব্যবহার শিখেছিল তার প্রমাণ আমরা পুরাণ সহ বিভিন্ন মনীষীর জীবনচর্যা থেকে অবগত হয়েছি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় পুলিন বিহারী দাসের কাছ থেকে লাঠিখেলার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এই আদি পরম্পরাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। অনুষ্ঠানে ভাবসংগীত পরিবেশন করেন কাকলী ঘোষ। সংগীত পরিবেশন করেন অজন্তা রায়, সুচরিতা সিকদার। নৃত্য পরিবেশন করেন বৈশাখী কুণ্ডু। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রীনা ব্যানার্জী, দোলন চক্রবর্তী ও সায়নী বসাক। সঞ্চালিকা সঞ্চিতা সরকারের শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটির পর্যবেক্ষণে ছিলেন ভরত কুণ্ডু।

মেদিনীপুর নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ১ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর হলের রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চে দ্বিতীয় বর্ষ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রার্থনানন্দ মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভগিনী নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি অঞ্জলি সিনহা, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ হৃষিকেশ দে, ডাঃ সুভাষ রঞ্জন মণ্ডল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনোজ খাজাঞ্চি, ডাঃ আশিস ঘোষ, সমাজ সেবী মৃগাঙ্ক মাইতি। অনুষ্ঠানে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। পূজ্য মহারাজ তাঁর বক্তব্যে মানব কল্যাণে সেবার অপরিসীম গুরুত্বের কথা তুলে ধরে বলেন, ভগিনী নিবেদিতার আদর্শকে সামনে রেখে ট্রাস্টের এই রক্তদান শিবির সমাজ কল্যাণের কাজে লাগবে। শিবিরে পঞ্চাশ জনেরও বেশি রক্তদাতা রক্ত দান করেন।

জগদ্দলে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম মহোৎসব উদ্‌যাপন

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম মহোৎসব উদ্‌যাপন সমিতি-র উদ্যোগে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাটপাড়া ও জগদ্দল নগরের পরিচালনায় এবং ধর্ম জাগরণ সমন্বয় বিভাগের সহযোগিতায় এই বছর প্রথম 'শ্রীকৃষ্ণ জন্ম মহোৎসব' উদ্‌যাপিত হলো। গত ২৭ আগস্ট, জগদ্দল সার্কাস মোড় থেকে শুরু হয়ে ভাটপাড়া বলরাম সরকার ঘাট পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ জন্ম মহোৎসব উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই শোভাযাত্রায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের উপস্থিতি সবার নজর কাড়ে। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পূজ্য সাধুসন্ত-সহ বৈষ্ণব ও মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। সন্ত সঞ্জয় শাস্ত্রী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলা কার্যবাহ ইন্দ্রনাথ রায়, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের রোহিত সাউ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সঙ্ঘানুরাগী অসংখ্য কার্যকর্তার উপস্থিতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ননিহাঁড়ি ভাঙার মধ্য দিয়ে বলরাম সরকার ঘাটে এই মহতী কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সংস্কার ভারতী রায়গঞ্জ চর্চাকেন্দ্রের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৪ সেপ্টেম্বর সংস্কার ভারতী রায়গঞ্জ চর্চাকেন্দ্রের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট হলে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. দিলীপ কুমার রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি এবং ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের ফিল্ড ও পাব্লিসিটি অফিসার বিরাজ নারায়ণ রায়। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি বিপ্লব কুমার দেব, প্রান্ত সাধারণ সম্পাদক বিকাশ কুমার ভৌমিক এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক মুটুকেশ্বর পাল।

উল্লেখ্য, গত ১৫,১৮ ও ২৫ আগস্ট সাতটি বিষয়--- নৃত্য, সংগীত, অঙ্কন, আবৃত্তি, তবলা-লহড়া, কৃষ্ণ সাজো ও যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতায় ৮৬৩ জন অংশগ্রহণ করেন। এদিন ৯২ জন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এরপরে সংস্কার ভারতী রায়গঞ্জ চর্চাকেন্দ্রের শিল্পীরা যোগব্যায়াম-সহ বর্তমান সময়োপযোগী নৃত্যনাট্য উপস্থাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা সমিতির সহ সম্পাদিকা শ্রীমতী সুতপা মিশ্র। রায়গঞ্জ চর্চাকেন্দ্রের সংযোজক জয়ন্ত রায়চৌধুরীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মাতৃবন্দনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

আরজি কর কাণ্ডে জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতির পদযাত্রা ও প্রতিবাদ সমাবেশ

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ছাত্রী তিলোত্তমার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতি-র উদ্যোগে মধ্য কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যারে গত ৩১ আগস্ট সংঘটিত হয় একটি সমাবেশ ও পদযাত্রা। এই নাগরিক প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন শিল্পী পাপিয়া দেবরাজন, প্রাক্তন বিধায়ক ডলি রায়, বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাতি শান্তনু মুখোপাধ্যায়, নাতনি নীহারিকা মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত জয়শ্রী পত্রিকার প্রতিনিধি নিতাই চন্দ্র দাশ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সমাজসেবী সংগঠন 'পথের দাবী'-র পক্ষে অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিব্রত আর্য প্রমুখ। অসংখ্য নেতাজীপ্রেমীদের সঙ্গে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট আইনজীবী, লেখক-লেখিকা, বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকর্তা ও স্থানীয়রা। ছিলেন সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীরাও। তিলোত্তমার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করে, বিপ্লবী লীলা রায়-বীণা দাস-প্রীতিলতার মাটিতে তিলোত্তমার জন্য ন্যায়বিচার চেয়ে মুহুর্মুহু স্লোগানে মুখরিত হয় এই প্রতিবাদী পদযাত্রা। অগণিত বিপ্লবীর স্মৃতিবিজড়িত বিপ্লবতীর্থ 'মলঙ্গা লেন'-এ পদযাত্রাটি শেষ হলে সেখানে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে ভয়াবহ নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

বেহালায় শ্রীঅরবিন্দ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

ঋষি অরবিন্দের ১৫৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ১১ আগস্ট, বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্র, সখের বাজারের শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র এবং শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, আর্কেডিয়ার যৌথ উদ্যোগে বেহালার ঐক্যতান অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট অরবিন্দ গবেষক গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ এবং শিক্ষক ও অরবিন্দ বিশেষজ্ঞ ভাস্কর মুখার্জি। স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলন এবং শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। বিবেকানন্দ পাঠচক্রের তরুণ সদস্যেরা সমবেত স্তোত্রপাঠ করেন এবং বিশিষ্ট গায়ক দেবীপ্রসাদ রায় শ্রীঅরবিন্দ প্রণাম গীতি পরিবেশন করেন। প্রত্যেক বক্তা ঋষি অরবিন্দের ভারতভক্তি তথা অধ্যাত্ম সাধনার বিষয়ে আলোকপাত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় চক্রবর্তী।

দশলক্ষণ পর্ব

এক স্বল্প পরিচিত ভারতীয় উৎসব

সুখময় মাজী

ভারতীয় সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান সত্ত্বেও এখানে বিবিধের মাঝে মহান মিলন চোখে পড়ে। ভারতীয় সংস্কৃতিরই অপর নাম হিন্দু সংস্কৃতি। এর মধ্যে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব, সৌর, বৌদ্ধ, জৈন্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার প্রবাহ চোখে পড়ে। এখানে ভগবান বুদ্ধকে যেমন বিষ্ণুর অবতার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, জৈন্যধর্মের আদি প্রবর্তক ঋষভদেবকেও তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক যুগেও যেমন বৈদিক সংস্কৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রবাহের মিলনে হিন্দু সংস্কৃতি এক মহানদীর রূপ লাভ করেছে। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'র চেয়ে বড়ো উদাহরণ আর কী হতে পারে! তবে দুঃখের বিষয়, আমরা এক ধারার মানুষ অপর ধারার পালাপার্বণ সম্বন্ধে খুব কম খবরই রাখি। বিশেষত জৈন সম্প্রদায় অত্যন্ত রক্ষণশীল হওয়ার কারণে এবং পশ্চিমবঙ্গে জৈন জনসংখ্যা খুব কম হওয়ার কারণে জৈন পার্বণ সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গালির ধারণা প্রায় নেই বললেই চলে।

জৈন পন্থে অনেক উৎসব পালন করা হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো উৎসব হলো দশলক্ষণ বা পর্যূষণ মহাপর্ব। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায় পৃথক পৃথক ভাবে এই উৎসব পালন করে থাকে। প্রথমে সাত দিন ধরে চলে শ্বেতাম্বরদের উৎসব। সেই উৎসব শেষ হওয়ার ঠিক পরের দিন থেকে শুরু হয় দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎসব। শ্বেতাম্বর জৈনগণ সাধারণভাবে এই উৎসবকে পর্যূষণ নামে অভিহিত করেন, দিগম্বরদের মধ্যে এই উৎসব দশলক্ষণ উৎসব নামে পরিচিত। ভাদ্র শুক্লা পঞ্চমীতে দিগম্বরদের এই উৎসব শুরু হয়।

জৈনপন্থ মূলত অহিংসা আধারিত ধর্ম। কিন্তু এই অহিংসা সাধনমাত্র, সাধ্য নয়। সাধ্য তো পরমাত্মরূপ অর্জন। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহের মাধ্যমে নিজ আত্মাকে কলুষমুক্ত করে জীবাত্মা থেকে পরমাত্মার দিকে যাত্রার পথই হলো জৈনপন্থ। গৃহস্থ মানুষের পক্ষে উপরোক্ত পাঁচ ব্রত অক্ষরে অক্ষরে পালন করা অসম্ভব। বেঁচে থাকার জন্য এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষকে কোনও না কোনওভাবে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হিংসা, মিথ্যা, ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়। সেই কারণে মুনিদের জন্য এই ব্রতগুলি মহাব্রতরূপে পালনীয় হলেও গৃহস্থদের জন্য কিছু নমনীয়তা রাখা হয়েছে। গৃহস্থদের জন্য অহিংসার অর্থ সম্পূর্ণরূপে হিংসা পরিত্যাগ নয়, জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম হিংসা হিসেবেই গণ্য হয়।

তবুও আমাদের আত্মা যাতে অধর্ম ও পাপের দ্বারা কলুষিত না হয়, সেজন্য বিভিন্ন প্রকার উৎসবের প্রচলন হয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে মানুষ এই পাঁচ ব্রত অনুশীলনের জন্য নিজেদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে। এই রকমই একটি পর্ব হলো দশলক্ষণ মহাপর্ব। এটি আত্মার বিশুদ্ধীকরণের এক প্রয়াস। জীবনের বিভিন্ন দোষ থেকে নিজেকে রক্ষার উৎসব হলো দশলক্ষণ। দশলক্ষণ উৎসবে দশটি ধর্মের বিশেষভাবে চর্চা ও অনুশীলন করা হয়। এই দশটি ধর্ম হলো— উত্তম ক্ষমা, উত্তম মার্দব, উত্তম আর্জব, উত্তম শৌচ, উত্তম সংযম, উত্তম তপ, উত্তম ত্যাগ, উত্তম আকিঞ্চন ও উত্তম ব্রহ্মচর্য। এই দশটি ধর্ম কোনো সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়। এগুলি হলো মানুষের আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। যে কোনো মানুষের আত্মার এগুলি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সংসারের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পরিভ্রমণ করতে করতে মান, মায়া, ক্রোধ, লোভ, কাম ইত্যাদির প্রভাবে আমাদের আত্মার এই ধর্মগুলি আবৃত হয়ে যায়, প্রচ্ছন্ন থেকে

যায়। একমাত্র সচেতন প্রয়াসের দ্বারাই এই ধর্মগুলির পুনর্জাগরণ সম্ভব। এই প্রয়াসেরই উৎসব পর্যুষণ বা দশলক্ষণ পর্ব। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, প্রতিটি ধর্মের আগে 'উত্তম' শব্দটি যুক্ত রয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, এগুলির অনুশীলন আমাদের সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত করতে হবে। প্রথম চারটি ধর্মের অনুশীলন আমাদের মনের জন্য, পরবর্তী তিন ধর্ম আমাদের বচনের জন্য এবং শেষ তিনটি ধর্ম হলো আমাদের কায়া অর্থাৎ শরীরের জন্য। এখন এই দশটি ধর্ম সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

উত্তম ক্ষমা— উৎসবের প্রথম দিনের বিষয় উত্তম ক্ষমা। আমাদের মনের মধ্যে যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, সেই ক্রোধ থেকে নিজেকে বাঁচানোর অভ্যাসই হলো উত্তম ক্ষমা। এই দিন সকলেই প্রয়াস করে যাতে কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের উপর ক্রোধ না হয়। 'পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমি কোনোভাবেই রাগান্বিত হব না'— এটাই এই দিনের ভাবনা। ক্রোধের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারলেই ক্ষমাধর্মের প্রকাশ ঘটে।

উত্তম মার্দব— মার্দবের অর্থ মৃদুতা; বিনয়ও বলা যেতে পারে। অভিমান, অহংকার, দর্প ইত্যাদি দোষগুলিকে হ্রাস করাই হলো মার্দব। 'জগতের প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তু— সবই আমার মতো; আমি কারও চাইতে বড়ো বা উচ্চ নই'— এই ভাবনাই মার্দব। আমরা সচরাচর অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে কখনো সুপিরিয়র কমপ্লেক্সে কখনো বা ইনফিরিয়োর কমপ্লেক্সে ভুগি। এই ভাব আমাদের মন ও আত্মাকে বিকৃত করে। এই দ্বিতীয় দিনে আমাদের এই অনুভবের উপর জোর দিতে হয় যে, এগুলো মানসিক বিকৃতিমাত্র এবং এইসব মানসিক বিকৃতি আমাদের মন থেকে দূর করতে হবে। আমাদের আত্মার বাস্তবিকতাকেই দেখতে হবে, বুঝতে হবে। বাস্তবে জগতের সমস্ত আত্মা একই রূপ, এক সমান। কেউ কারও চেয়ে বড়োও নয়, ছোটোও নয়। এই উপলব্ধিটা এলেই আমরা কোনও জীবকে নিজের চেয়ে হীন বা অধিক ভাবার প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হব।

উত্তম আর্জব— আর্জব কথার অর্থ হলো ঋজুতা বা সরলতা। কপটতা বা মায়াচার থেকে মুক্ত হওয়াই আর্জব। আমাদের মন, বচন ও কায়ার ক্রিয়ার মধ্যে সমানতা আনার প্রয়াসের উপর জোর দেওয়া হয় এই দিনে। সাধারণভাবে অনেক সময় আমরা দেখি, কারও মনের মধ্যে এক রকম ভাব, কিন্তু মুখের কথায় আমরা সেই ভাবনাকে গোপন করি। আবার অনেক সময় আমাদের কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকে না। এটাই কপটতা। আমাদের মানসিক, বাচনিক ও কায়িক ক্রিয়ার মধ্যে তফাত থাকলে প্রথম প্রথম হয়তো অন্যে তা বুঝতে পারে না, কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেলে সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়। তাই মায়াচারকে ত্যাগ করে আমাদের মনে যা আছে মুখে তার প্রকাশ হওয়া উচিত এবং কাজে তার প্রতিফলন ঘটা উচিত। দশলক্ষণের তৃতীয় দিনে চরিত্রে আর্জব ধর্মের বিকাশ ও বৃদ্ধির প্রয়াস করা হয়।

উত্তম শৌচ— চতুর্থ দিনের ধর্ম হলো উত্তম শৌচ। শৌচের অর্থ হলো স্বচ্ছতা, নির্মলতা বা পবিত্রতা। পবিত্রতা তখনই আসে যখন লোভ নামক রিপু (জৈন পরিভাষায় কষায়) দূর হয়। লোভ কমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পবিত্রতার বৃদ্ধি হতে থাকে। লোভ এমন এক বিষয় যা আমাদের ক্রমাগত অসন্তোষের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। জগতের সমস্ত ধনসম্পদ ও ভোগ্যবস্তু আয়ত্তে এলেও লোভের পরিতৃপ্তি ঘটে না। বরং মানুষ যত পায়, তত তাঁর লোভ বাড়তে থাকে। এই লোভই আমাদের অপবিত্রতার দিকে নিয়ে যায়। তাই ধীরে ধীরে লোভকে দমন করতে পারলে আমাদের জীবনে পবিত্রতা আসে, নির্মলতা আসে; আমাদের জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। সাধারণ জীবনযাপন এবং উচ্চ চিন্তার— আদর্শ আমাদের জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে। আমাদের আয়ু নিতান্তই সীমিত। এই ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের ততটুকুই সংগ্রহ করা উচিত, যতটা আমাদের প্রয়োজন; তার চেয়ে সামান্যতম বেশি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই আমাদের জীবনকে পীড়িত করে তোলে। অনেক বেশি সম্পদ, অনেক বেশি সামগ্রী আমাদের হাতে এলে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার চিন্তা আমাদের মধ্যে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি করে। এসব কাজে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় হয়। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের পুরোটাই এসব কাজেই কেটে যায়। তাহলে আমারাও আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা তো দূর, ভাববারই সময় কোথায় পাব! এই জন্যই লোভ কষায়কে কম করার চেষ্টা করা উচিত এবং লোভকে দমন করার নামই হলো শৌচ।

উত্তম সত্য— উপরোক্ত চার ধর্ম আমাদের মানসিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। যখন এগুলির অনুশীলনের মাধ্যমে, আমাদের মানসিক বিশুদ্ধির মাধ্যমে মন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, মন ক্ষমা, মার্দব, আর্জব ও শৌচের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন আমাদের মুখ থেকে সত্য ছাড়া আর কিছু বেরোনো সম্ভব নয়। তখন আমাদের বচনের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়, অপরের মনের মধ্যে এই ধারণাই তৈরি হয় যে, এই ব্যক্তি সদা সত্য কথাই বলে। সত্য কথা বলা কখন সম্ভব? যখন আমার মধ্যে ক্রোধ থাকে না, মান অর্থাৎ দম্ভ থাকে না, মায়াচার থাকে না এবং লোভ থাকে না? ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ থেকে মুক্ত মানুষ কোনো পরিস্থিতিতেই মিথ্যা বলতে পারে না। তাই উৎসবের পঞ্চম দিনে আমাদের চেষ্টা করতে হয় যাতে আমি মিথ্যা না বলি, অপ্রয়োজনীয় কথা না বলি। সম্ভব হলে সারা দিন মৌন অবলম্বন করা উচিত। সেটা সম্ভব না হলে শুধু হিত, মিত ও প্রিয় বচনই বলা উচিত।

উত্তম সংযম— সংযমের অর্থ হলো দমন বা নিয়ন্ত্রণ। কাকে দমন করতে হয়, কার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়? নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয় আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের উপর। সেই সঙ্গে ষটকায় জীব অর্থাৎ

সমগ্র জীবজগতের সুরক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। আমার দ্বারা যাতে সজ্ঞানে কোনও জীবের ক্ষতি না হয়। অতিক্ষুদ্র অণুজীব থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলকে কীভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি, কোনও জীবের প্রতি হিংসা না করে কীভাবে আমরা জীবনযাপন করতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হয়। মোবাইল ফোনে আসক্তি বর্তমানের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। উৎসবের এই ষষ্ঠ দিনে আমাদের মোবাইল ফোন থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকার চেষ্টা করা উচিত। নিতান্ত জরুরি প্রয়োজনে শুধু ফোন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, কোন সময় ব্যবহার করব, সেটা আগেই স্থির করে নিতে হয়। ফেসবুক, হোয়াটস্অ্যাপ, ইউটিউব ইত্যাদি থেকে পূর্ণ বিরাম। এর মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আত্মসংযম ও আত্মশৃঙ্খল গড়ে ওঠে। আত্মসংযম গড়ে উঠলে আমরা আমাদের জীবনকে উন্নততর করে তুলতে পারি।

উত্তম তপ— তপ কথার অর্থ তপস্যা। কিন্তু এখানে সেই তপস্যা হলো আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বিধিসম্মত ক্রিয়া। জৈন পরিভাষায় বলা হয়, শরীরকে উত্তপ্ত করা। যেমন আমরা জলকে উত্তপ্ত করার জন্য সরাসরি উনুনের মধ্যে জল দিয়ে দিই না, একটি পাত্রের মধ্যে জল রেখে উনুনে চাপাই। পাত্র উত্তপ্ত হয় এবং তার মাধ্যমেই জল উত্তপ্ত হয়। তেমনি আত্মাকে উত্তপ্ত করার জন্য শরীরকে উত্তপ্ত করতে হয়, তার মাধ্যমেই জল উত্তপ্ত হয়। তেমনি আত্মাকে উত্তপ্ত করার জন্য শরীরকে উত্তপ্ত করতে হয়, তার মাধ্যমেই আত্মা উত্তপ্ত হয়। জৈন সিদ্ধান্ত অনুসারে তপ বারো প্রকার। এর মধ্যে ছয় প্রকার হলো বাহ্য তপ এবং ছয় প্রকার আভ্যন্তর তপ। অনশন, ঊনোদরী, বৃত্তি পরিসংখ্যান, রসপরিত্যাগ, বিবিক্ত শয্যাসন ও কায়ক্লেশ হলো বাহ্য তপ এবং প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত, স্বাধ্যায়, ব্যুৎসর্গ ও ধ্যান হলো আভ্যন্তর তপ। সব তপ করা সম্ভব না হলে আনুকূল্য অনুসারে যে কোনো এক বা একাধিক তপ এই দিন করা যেতে পারে।

উত্তম ত্যাগ— ত্যাগ শব্দের অর্থ বর্জন করা। এখানে দ্বিবিধ অর্থে ত্যাগ শব্দের প্রয়োগ হয়। প্রথমত, নিজের বদভ্যাস বা বদগুণ ত্যাগ করা কিংবা রাগদ্বেষ ত্যাগ করা এবং দ্বিতীয়ত, দান করা। দরিদ্রকে অর্থ দান করা, নিরন্নকে অন্ন দান করা, স্বধর্মীকে শাস্ত্রগ্রন্থ দান করা, ইত্যাদি সবই ত্যাগের মধ্যে পড়ে। নিজের প্রয়োজনের চেয়ে উদবৃত্ত বস্তু অন্যকে প্রদান করাও ত্যাগ। উত্তম ত্যাগধর্ম আমাদের শেখায় যে, মনকে নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট করে নিজের ইচ্ছা ও ভাবনাগুলিকে ত্যাগ করা সম্ভব। এতে আমরা আমাদের অনৈতিক ইচ্ছেগুলির উপর লাগাম পরাতে পারি। ত্যাগের ভাবনা আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

উত্তম আকিঞ্চন— আকিঞ্চন শব্দের অর্থ নিঃস্ব। আমি নিঃস্ব আমার কিছুই নেই, কোনোকিছুই আমার নয়— মনের মধ্যে এই ভাবনা জাগ্রত করার নামই আকিঞ্চন। তাই এইদিন সম্পূর্ণ বৈরাগ্যের সঙ্গে অতিবাহিত করতে হয়। মুনি মহারাজদের কাছে তো কোনও কিছুই থাকে না; ঘরদ্বার, আত্মীয়পরিজন ধনসম্পদ, আসবাবপত্র কিছু থাকে না। এমনকী দিগম্বর মুনির নিজের বস্ত্রটুকুও থাকে না। মুনিদের মতো গৃহীদের নিঃস্ব হলে চলে না। তাই নিজের স্বাভাবিক জীবনে অবস্থান করেও এইদিন অন্তরে নিজের মধ্যে মুনিভাব জাগ্রত করা উচিত। একান্তবাসের মধ্যে নিজের আত্মার ধ্যানের মাধ্যমে এই দিনটি কাটানোর উপদেশ দিয়েছেন আচার্যগণ। 'আমি একাকী এক আত্মা'— এই ধ্যান করতে পারলে ভালো হয়।।

উত্তম ব্রহ্মচর্য— এখানে ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ পবিত্রভাবে জীবনযাপন করা। এই দিন আমাদের প্রয়াস থাকে অব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হওয়ার, বাইরের জগৎ থেকে অন্তর্জগতের দিকে যাওয়ার তথা শরীর থেকে আত্মার দিকে যাওয়ার। ওই দিন বাইরের জগতের সঙ্গে যথাসম্ভব কম সম্পর্কে আসা দরকার। বাইরে বেরোনো, বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা থিয়েটার দেখা, ব্যবসাবাণিজ্যে নিয়োজিত থাকা ইত্যাদি যথাসম্ভব কম করা হয় ওই দিন। ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবীরা এদিন ছুটি নিয়ে বাড়িতেই একান্তে আত্মার চিন্তায় অতিবাহিত করেন। ভূমিশয্যায় শয়ন, সাত্ত্বিক আহার, অনাড়ম্বর জীবনযাপন ইত্যাদি এই দিনটির বৈশিষ্ট্য।

এই সব আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, দশলক্ষণ পর্ব সম্পূর্ণরূপেই এক আধ্যাত্মিক উৎসব। তাৎপর্য অনুধাবন করে এই উৎসব পালনের মাধ্যমে নিজের জীবনকে যেমন সুন্দর করা যায়, তেমনই আত্মা থেকে পরমাত্মা হওয়ার পথেও অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। ভারতীয় পরম্পরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী এবং সমস্ত সাধনার অন্তিম লক্ষ্য হলো আত্মার মুক্তি তথা মোক্ষ। বৌদ্ধ ও জৈনরা একেই নির্বাণ বলেন; অন্যেরা কেউ একে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন বলেন, কেউ কৃষ্ণলোক প্রাপ্তি, কেউ-বা শিবলোক গমন বলে অভিহিত করেন। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, মূল কথা হলো, আমাদের আর এই জন্ম-জরা-মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসতে হয় না। দশলক্ষণের দশদিন তীর্থঙ্কর ভগবানের বিশেষ পূজা, অভিষেক ইত্যাদির মাধ্যমে দিন শুরু হয় এবং এক এক দিন এক এক ধর্ম বিশেষভাবে পালনের মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত হয়। এই বছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় এই উৎসব পালন করেছেন এবং ৮ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত দিগম্বর সম্প্রদায় পালন করেছেন। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে বাঙ্গালি জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতি বছরই এই উৎসব পালন করে থাকেন। ◻

With Best Compliments from -

A Well Wisher

ভারতের প্রসিদ্ধ বিশ্বকর্মা মন্দিরসমূহ এবং জাতীয় শ্রম দিবসের ভাবনা

সৈকত চট্টোপাধ্যায়

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চক্র, দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূল, দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র শক্তি, রামায়ণে বর্ণিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা ভঙ্গ করা হরধনু তাঁরই সৃষ্টি। আয়ুধ নির্মাণকারী দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দেবতাদের মধ্যে বাস্তুকার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা নগরী, কুবেরের

অলকাপুরী, স্বর্ণলঙ্কা তাঁরই সৃষ্টি। তিনি নিজেই চতুঃষষ্টিকলা, স্থাপত্যবেদ, উপবেদের উদ্গাতা ও প্রকাশক। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথমূর্তি তথা ব্রহ্মার পুষ্পকরথ (বিমান) তৈরি করা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পূজা হয় ভাদ্রমাসে। ভাদ্র সংক্রান্তিতে সূর্য যখন সিংহ রাশি থেকে কন্যারাশিতে গমন করে সেই কন্যা সংক্রান্তি তিথিতে বিশ্বকর্মা পূজা হয়।

দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্বকর্মা মন্দির হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডির মাংভায়িন রোডের ওপর অবস্থিত। সারা দেশ থেকে মানুষ সেখানে পূজা দিতে যায়। দিল্লির পাহাড়গঞ্জে প্রাচীন বিশ্বকর্মা মন্দিরটি স্থানীয়রা মনে করেন পাণ্ডবদের দ্বারা নির্মিত। রাজস্থানের জয়পুর ছাড়াও যোধপুরে পঞ্চমুখী বিশ্বকর্মা আছে যেটি বিশ্বকর্মা সমাজ দ্বারা পরিচালিত। এই সমাজ দেশের বিভিন্ন স্থানে দেবশিল্পীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। অসমের গুয়াহাটি, মধ্যপ্রদেশের রতলাম, বিহারের বেতিয়া, মোতিহারী, মুঙ্গের, পঞ্জাবের ফাগওয়াড়া, গুজরাটের ভারুচ, মহারাষ্ট্রের নাসিক, ঔরঙ্গাবাদ, মুম্বইয়ের মীরা রোড, খেরানে-তে প্রসিদ্ধ বিশ্বকর্মা মন্দির আছে।

ভারতজুড়ে দেবশিল্পীর নামাঙ্কিত একাধিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী প্রযুক্তি, যন্ত্রবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষা অর্জন করে চলেছে। মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের উপকণ্ঠে কোণ্ডোয়াতে 'বিশ্বকর্মা ইউনিভার্সিটি', হরিয়ানার পালওয়াল জেলার দুধোলায় 'শ্রীবিশ্বকর্মা স্কিল ইউনিভার্সিটি'র মতো একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা আইটিআই। মহারাষ্ট্রের পুনেতে সাবিত্রীবাঈ ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিশ্বকর্মা ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে সাকচিতে বিশ্বকর্মা টেকনিকাল ইনস্টিটিউট, হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায় জয়সিংহপুরে বিশ্বকর্মা আইটিআই লম্বাগাঁও, উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীতে বিশ্বকর্মা প্রাইভেট আইটিআই, এই রাজ্যে সোনভদ্রের ডাল্লায় বিশ্বকর্মা আইটিআই, বিহারের রোহতাস জেলার ডেহরি-অন-শোনে বিশ্বকর্মা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, এই রাজ্যেরই মুজফ্ফরপুরের তুরকিতে বাবা বিশ্বকর্মা প্রাইভেট আইটিআই, হরিয়ানার সিরসায় এলেনাবাদে বিশ্বকর্মা আইটিআই কলেজ, মধ্যপ্রদেশের পান্নায় বিশ্বকর্মা আইটিআই-এর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরবচ্ছিন্নভাবে কারিগরি শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।

রাষ্ট্রবাদী শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ মে দিবসের পরিবর্তে বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিকে জাতীয় শ্রম দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। তাদের তরফে এই দিনটিকে শ্রম দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া পর সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে দেশ জুড়ে পরিবহণ ক্ষেত্র ও কলকারখানা শ্রমিকদের ব্যাপক সমর্থন মেলে এবং তারপর ধীরে ধীরে অনেকগুলি রাজ্যের সরকারি স্তরেও নীতিগত পরিবর্তন দেখা যায়। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি রাজ্য বিশ্বকর্মা জয়ন্তীকে শ্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

ভারতের সবচেয়ে বড়ো শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের মতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা বর্তমান দিনের চিন্তা প্রক্রিয়া পরিবর্তনের প্রতীক। কাজকে যজ্ঞ হিসেবে ধরা হয়। দেশের আপামর শ্রমিক-কারিগর-বাস্তুকার সমাজ প্রতিনিয়ত সেই কর্মযজ্ঞেই যুক্ত থাকেন। দেবশিল্পী হলেন সেই নিরন্তর কর্মযজ্ঞের দৃষ্টান্তস্বরূপ। ঐতিহ্যগতভাবে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সেখানে যুক্ত ও কর্মরত শ্রমিকদের সম্পর্ক পারিবারিক সম্পর্কের মতোই। বিএমএস পরিবার এই 'শিল্প সম্পর্ক'টিকে একটি মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং 'শিল্প পরিবার'-এর মহান ধারণাকে সামনে রেখেছে। এটি পশ্চিমের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বা বামেদের দ্বারা মালিকপক্ষকে শ্রেণীশত্রু বানানোর ধারণার বিপরীত। এর থেকে 'ত্যাগ-তপস্যা-বলিদান', 'কাজই পূজা', 'শ্রমের জাতীয়করণ' ইত্যাদি স্লোগানগুলিকে আত্মস্থ করেছে রাষ্ট্রবাদী শ্রমিক সমাজ। বিদেশি মে দিবসের তুলনায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বহুমুখী সৃষ্টির ইতিহাস ভারতীয় শ্রমিকসমাজকে ইতিবাচক বার্তা দিতে অবশ্যই সহায়ক হবে। ইতিমধ্যেই গোটা দেশে বিশ্বকর্মা জয়ন্তী রাষ্ট্রীয় শ্রম দিবস রূপে পরিচিতি ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। □

গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক বাড়ি

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। রাজশাহীতে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের পৈতৃক বাড়িটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নগরের ঘোড়ামারা মহল্লার মিয়াপাড়ায় এই বাড়ির আঙিনায় এখন ইটের স্তূপ পড়ে আছে। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার পর সারাদেশে হিন্দুদের ব্যাপক হামলা শুরু হয়। ৬ ও ৭ আগস্ট দুদিন ধরে বাড়িটি ভাঙা হয়।

সংস্কৃতি কর্মীদের দাবির মুখে কিছুদিন আগে ঐতিহাসিক বাড়িটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে জঙ্গি আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাড়িটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। খবর পেয়ে রাজশাহীর চলচ্চিত্রকর্মীরা ভিড় করেন বাড়িটিতে। এ সময় বাড়িটির পাশেই হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চলচ্চিত্রকর্মীদের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে দাবি করেছেন ঠিকাদার। তবে কলেজের অধ্যক্ষ বলছেন, তাদের সাবেক শিক্ষার্থীরা এটি ভেঙে ফেলেছেন।

জানা গেছে, ঋত্বিক ঘটক জীবনের শুরুর সময়টা রাজশাহীর এই পৈতৃক বাড়িতে কাটিয়েছিলেন। এখানে থাকার সময় তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ও রাজশাহী কলেজে পড়েছেন। রাজশাহী কলেজ ও মিয়াপাড়ার সাধারণ গ্রন্থাগার মাঠে কালজয়ী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে নাট্যচর্চা করেছেন। ওই সময় 'অভিধারা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন ঋত্বিক। তাঁকে ঘিরেই তখন রাজশাহীতে সাহিত্য ও নাট্য চর্চা বেগবান হয়। এই বাড়িতে থেকেছেন ঋত্বিক ঘটকের ভাইঝি বরেণ্য কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী।

এই বাড়ির পুরো ৩৪ শতক জমি আশির দশকের শেষদিকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক সরকার রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে ইজারা দেয়। কলেজটি বাড়ি ঘেঁষেই পশ্চিম পাশে রয়েছে। ২০১৯ সালে বাড়িটির একাংশ ভেঙে

ফঃ ৫

সাইকেল গ্যারেজ তৈরির অভিযোগ উঠেছিল কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। তখন রাজশাহী-সহ সারাদেশে প্রতিবাদ জানানো হয়। পরে ২০২০ সালে বাড়িটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয় রাজশাহী জেলা প্রশাসন।

৫ আগস্ট সরকার পতনের পর শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ চাপিয়ে হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ আনিসুর রহমান পুরোনো স্থাপনাগুলো ভেঙে ফেলেছেন বলে অভিযোগ করেছেন সাংস্কৃতিককর্মীরা। ঋত্বিক ঘটকের বাড়িতে গিয়ে স্থানীয় সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিকর্মীরা দেখতে পান, সেখানে বাড়ির কোনো চিহ্ন নেই। পুরো এলাকাজুড়ে পুরোনো ইটের স্তূপ পড়ে আছে।

রাজশাহীর চলচ্চিত্রকর্মীরা কলেজ অধ্যক্ষ আনিসুর রহমানের কাছে জানতে চান, ঋত্বিক ঘটকের বাড়িটি কারা কীভাবে ভাঙলো। অধ্যক্ষ বলেন, তিনি জানেন না, দুর্বৃত্তরা এটা ভেঙেছে। এ সময় চলচ্চিত্রকর্মী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। সেখানে থাকা শ্রমিকরা তখনো বাড়ি ভাঙার কাজ করছিল। তারা জানায়, তারা এখানে কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভাঙার কাজ করছে।

অধ্যক্ষ আরও জানান, ৬ আগস্ট খোলার জন্য তিনি আসেন। তখন বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরাও এখানে আসেন। তারা বলতে থাকেন বঙ্গবন্ধুর ছবিটা নামিয়ে নিতে। তখন তিনি ব্যানারগুলো নামিয়ে ফেলেন। শিক্ষার্থীরা তখন বলেন, এই জায়গাটা ভেঙে ফেলতে হবে। তখন তিনি প্রশ্ন করেন, এটা কেন ভেঙে ফেলতে হবে? পরে সেদিনের মতো শিক্ষার্থীরা চলে যান। পরে সেদিন রাত ৮টায় তিনি ফোনে জানতে পারেন, বাড়িটি ভাঙা হচ্ছে। তখন এসে দেখেন, ছয় থেকে সাতজন শ্রমিক এটা ভাঙছে। শ্রমিকরা তাকে জানিয়েছেন, কয়েকজন তাদের টাকা দিয়ে এটা ভাঙতে বলেছেন। ছাত্ররা এটা করিয়েছেন। তার ইন্ধনে এটা হয়নি। কারণ, জায়গাটা তারা হাসপাতালের আউটডোর ও ইনডোর হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ আনিসুর রহমান জানান, এটা (ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি) সংরক্ষণের এখন তো আর কিছু নেই। এটা আউটডোর হিসেবে এখন কিছু করবেন। তখন সাংবাদিকেরা বলতে থাকেন, আপনাদের প্ল্যানেই এটা ভাঙা হয়েছে। তখন সেখানে ঠিকাদার শামীম মিয়াকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমরা ৫ তারিখে এসে দেখি, ছাত্ররা নাকি বাড়িটির সামনে একটি দেয়াল ভেঙে ফেলেছে। তখন কলেজের স্যাররা আমাকে ডেকে এনে বলেন, এটা ভেঙে সরিয়ে দিন। তারপর থেকে আমি শ্রমিক নিয়ে এটা ভেঙেছি।

এরপর জেলা প্রশাসকের কাছে যান চলচ্চিত্রকর্মীরা। জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ তদন্তের জন্য সময় নিয়েছেন। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (শিক্ষা ও আইসিটি)। চলচ্চিত্রনির্মাতা মহম্মদ তাওকীর ইসলাম সাইক বলেন, রাজশাহীতে ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক এই নিবাসের একাংশ ২০১৯ সালে ভেঙে সাইকেল গ্যারেজ করেছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এবার তারা পুরোটাই গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমরা এটা কোনোভাবেই মানবো না। এজন্য জেলা প্রশাসক দপ্তরে এসেছি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জেলা প্রশাসক জানান, জেলা প্রশাসন এটা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিল। পরে তারা ভূমি মন্ত্রণালয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে তারা ঋত্বিক ঘটকের বাড়িটি ইজারা থেকে মুক্ত করে ঋত্বিক ঘটকের নামে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই চিঠিটা মন্ত্রণালয়ে আছে। চলচ্চিত্রকর্মীরা ও কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে এসেছিলেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (শিক্ষা ও আইসিটি) তদন্ত করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। সেটি দেখা হচ্ছে। যারা এই বাড়ি ভাঙায় জড়িত আছে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা সংরক্ষণের জন্য যা করা প্রয়োজন, তা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে করবেন।

এদিকে, উন্নয়ন গবেষণাধর্মী যুব সংগঠন 'ইয়ুথ অ্যাকশন ফর সোশ্যাল চেঞ্জ'-এর সভাপতি মহম্মদ শামীউল আলিম শাওন এবং সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ আতিকুর রহমান আতিকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ঋত্বিক কুমার ঘটকের পৈতৃক বাড়ি পরিদর্শন করেন। এরপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠককালে চলচ্চিত্র নির্মাতা তাওকীর ইসলাম, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র সম্মাননার উৎসব পরিচালক শাহারিয়ার চয়ন, মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রাহক ও গবেষক ওয়ালিউর রহমান বাবু-সহ ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সদস্য এবং চলচ্চিত্রকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ফিরে দেখা

কানাডাপ্রবাসী রীনা চক্রবর্তী রাজশাহীতে এসে ছুটে গিয়েছিলেন মামা ঋত্বিক ঘটকের বাড়িতে। ৬২ বছর আগে বাড়িটি ছেড়ে যাওয়ার সময় চোখ না-ফোটা ছ'টি বিড়ালের বাচ্চা রেখে গিয়েছিলেন। এত বছর পরও তাঁর মনে হলো, 'গিয়ে দেখি, বাচ্চাগুলোর চোখ ফুটেছে কিনা!'

মনে হলো মাঝখানের বছরগুলো যেন উড়ে গেছে। তিনি সেই খুকিটিই রয়ে গেছেন। দেড় দশক আগে ২০০৯ সালে রাজশাহী ফিল্ম সোসাইটির আয়োজন ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে এসে তিনি এ অনুভূতির কথা বলেছিলেন। ঋত্বিকের এই বাড়ির সৌজন্যে বহু বরেণ্য ব্যক্তি রাজশাহী চিনেছেন। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক একবার ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' সিনেমা দেখার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সেই সিনেমা দেখার মুগ্ধতা বুকের মধ্যে মধুর মতো জমে আছে।'

ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতিধন্য রাজশাহীর বাড়িটি আর নেই, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটিই এখন যেন 'মেঘে ঢাকা তারা' হয়ে গেল। আর দেখা যাবে না। তবে বাড়ির স্মৃতিটা ঋত্বিকপ্রেমীদের বুকের মধ্যে মধুর মতোই জমে থাকবে। ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর বোন প্রতীতি দেবী যমজ ছিলেন। 'ঋত্বিককে শেষ ভালোবাসা' নামে স্মৃতিকথার বই আছে তাঁর। বইয়ে বাড়িটির স্মৃতিচারণায় প্রতীতি দেবী লিখেছেন, 'বাবা অবসর নেওয়ার পরে রাজশাহীতে এসে বসবাস শুরু করলেন। আমাদের বিশাল বাড়ি। কাছেই সাগরপাড়ায় থাকতেন আমার মাতামহ, নামকরা অ্যাডভোকেট মহেশ্বর ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্র মৈত্র পাকিস্তানের সংসদ সদস্য, সুরেশ মৈত্ররা ছিলেন আমার মায়ের পিসতুতো ভাই। অখণ্ড

ভারতের সংসদ সদস্য কিশোরী মোহন চৌধুরী ছিলেন আমার মাসতুতো ভাই।'

কারা এই বাড়িতে এসেছেন, সেই প্রসঙ্গে প্রতীতি দেবী লিখেছেন, 'আমরা যখন রাজশাহীতে, তখন সেখানকার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের। পুঠিয়ার রাজা, নাটোরের মহারাজা, দীঘাপতিয়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবছর শীতে সাহিত্য-সংগীত সম্মেলন হতো। এসব সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আমার বড়ো ভাই মনীশ ঘটক। এই সূত্রে আমাদের রাজশাহীর বাড়িতে পদার্পণ ঘটেছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখের। শরৎচন্দ্রের কথা আমার মনে আছে। তিনি চা-কফি ছাড়া কিছু খেতেন না। এত শান্ত আর কথা কম বলতেন যে আমি একবার দাদাকে বলি, এই তোমাদের শরৎচন্দ্র? ইনি তো কথাই বলেন না।'

প্রতীতি দেবীর লেখায় আরও অনেক বরেণ্য ব্যক্তির তাঁদের রাজশাহীর বাড়িতে আসার কথা উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, 'আমার বড় দাদার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন হুমায়ুন কবীর, সৈয়দ মুজতবা আলি। শেষোক্ত জনের বড়ো ভাই আইসিএস এসএম আলি ছিলেন আমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু। সে সময় রাজশাহীতে হিন্দু মুসলমানের কোনো বিভেদ ছিল না। সাম্প্রদায়িক শব্দটাই কখনো শুনিনি। আমাদের বাড়িতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জ্ঞানী-গুণীরা তো আসতেনই। সাধারণ শ্রেণীরও ছিল অবাধ প্রবেশ। হিন্দু ছেলেদের পাশাপাশি বহু মুসলমান ছেলে আমাদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছে। শিল্পী জয়নুল আবেদিনও আমাদের বাড়িতে থেকেছেন। সংগীত সম্মেলনে যোগ দিতে ১৯৩৫ সালে এসেছিলেন ফয়েজ খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, তারাপদ ঠাকুর, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। উদয় শঙ্করও এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ঋত্বিকের ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে ঋত্বিক উদয় শঙ্করের কলকাতার বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেছে।'

যমজ ভাইয়ের স্মৃতি রোমন্থন করে প্রতীতি দেবী লিখেছেন, 'আমাদের রাজশাহীর বাড়ির বিশাল ছাদের ওপরে আমরা দুই ভাই-বোন ঘুড়ি ওড়াতাম। বাড়ির কাজের লোকেরা কাচ গুঁড়ো করে সুতোয় মাঞ্জা দিত। আমাদের ঘুড়িটা হঠাৎ কেটে যায়। সেটির সুতো ধরতে গিয়ে আমি ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত ও পায়ের হাড় দুই টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু ঋত্বিকের 'মা-মা' করে বুকফাটা কান্না শুনে সবাই ওকে নিয়েই টানাটানি করছে। সবাই ভাবছে ঋত্বিকের কিছু হয়েছে। আর আমি? ওই ভাঙা হাত ব্যান্ডেজ করে আবার ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গেছি। দুপুর হলেই ঋত্বিক আর আমি ছাদে চলে যেতাম। আমার কণ্ঠে ওর প্রিয় গান ছিল 'মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি/হে রাখাল, বেণু তবে বাজাও একাকী।'

প্রতীতি দেবী বলেন, '৫০ সালে আমার বিয়ে আর ওর (ঋত্বিক ঘটক) বিএ পাশ এক সঙ্গে হলো। ও কলকাতায় রয়ে গেল। ও জীবনে দুটো জিনিস কখনো মেনে নিতে পারেনি। এক দেশ ভাগ, দুই আমার বিয়ে। বিয়ে আমাদের জন্য অভিশাপ মনে করতেন। পরে ঋত্বিক ঘটকই হয়ে ওঠেন কালজয়ী চলচ্চিত্রকার ও পরিচালক। ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ির ৩৪ শতাংশ জমি ১৯৮৭-৮৮ সালের দিকে হোমিও কলেজের নামে ইজারা দেওয়া হয়েছিল।'

জানা গেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ পরে প্রতিষ্ঠানের নামে খারিজ করে দিয়েছে। সেখানে ভবন নির্মাণ করেছে। বাড়িটার একাংশ রাজশাহীর সংস্কৃতিকর্মীদের দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। ৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাড়িটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্রকর্মীরা বলছেন, ৬ আগস্ট দুপুর ১২টা ৪৪ মিনিট পর্যন্ত কলেজের সিসিটিভি চলছিল। এরপর থেকে সিসিটিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কোনো ফুটেজ ধারণ হয়নি।

তাঁদের অভিযোগ, এই ভাঙচুরে কলেজ প্রশাসনের হাত আছে। তবে কলেজের অধ্যক্ষ আনিসুর রহমান বলেন, 'এর আগেও সিসিটিভি বন্ধ হয়ে গেছে। এটা নতুন কিছু নয়। এটা আমরা বন্ধ করিনি।'

ঋত্বিক ঘটকের এই বাড়িকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে রাজশাহী ফিল্ম সোসাইটি। ২০০৯ সালে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন ঋত্বিক ঘটকের ভাগনি (মেজ বোন সম্প্রীতি দেবীর মেয়ে) কানাডাপ্রবাসী রীনা চক্রবর্তী এবং আরেক বোন প্রতীতি দেবীর মেয়ে আরমা দত্ত। বাড়িতে থেকেছেন ঋত্বিক ঘটকের ভাইঝি মহাশ্বেতা দেবী।

তখন রীনা চক্রবর্তী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেছিলেন, বাড়ির সামনের প্রাচীরের খানিকটা এখনো আছে। ছোটোবেলায় যাদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন, আড়ি দিতেন সব ওই প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়ে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তিনি এই বাড়িতে ছিলেন। প্রাচীরের পাশে অনেক মানুষ দাঁড়িয়েছিল। পাশেই ব্যানার্জি বাড়িতে রেডিয়ো ছিল। রেডিয়োতে ঘোষণা হলো, রাজশাহী পাকিস্তানে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষ লাফিয়ে উঠল। হাততালি দিতে লাগল। তিনিও তাঁদের সঙ্গেই হাততালি দিলেন। কিন্তু বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখেন সবার মুখ গোমড়া। এর তিনদিন পরই তাঁরা রাজশাহী ছেড়ে চলে যান। তিনিও স্মৃতি হিসেবে প্রাচীর থেকে একটি ইটের টুকরা তাঁর ব্যাগে ভরে নেন।

চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠানে তিনবার এসেছিলেন ঋত্বিক পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রের প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান, অভিনেতা নায়ক প্রবীর মিত্র-সহ বহু বরেণ্য ব্যক্তি। এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মহলের দাবির মুখে হোমিও কলেজের মিলনায়তনটি ঋত্বিক ঘটকের নামে করার দাবি ওঠে। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক একটি ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন। সেটি ওভাবেই রয়ে গেছে। বাড়ির পুরোনো অংশের দুই কক্ষের ভবনটির একটি কলেজের বহির্বিভাগ ও একটি গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বাড়ির পুরোনো অংশের দুই কক্ষের ভবনটির একটি কলেজের বহির্বিভাগ ও একটি গ্রন্থাগার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এখন সেসব শুধুই স্মৃতি।

ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি এফএমএ জাহিদ বলছেন, তাঁর বাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি ভাঙায় তিনি বেশি কষ্ট পেয়েছেন। এখন ভিটে সংরক্ষণের দাবি নিয়ে প্রশাসনের কাছে ছোটাছুটি করছেন। □

অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ ভারতীয় হকি দলের

নিলয় সামন্ত

হরিয়ানার সোনিপতের বিখ্যাত হকি প্রশিক্ষক শামশের সিংহ একদিন তার ক্যাম্পের সিনিয়র দল নিয়ে একটা টুর্নামেন্ট খেলতে যাওয়ায় তার কোচিং ক্যাম্পে পৌছাতে একটু দেরি হচ্ছিল। এদিকে কোচ দেরিতে আসায় কোচিং ক্যাম্পের শিক্ষার্থীরা মাঠের পাশের জামরুল গাছে ফল পাড়তে উঠলো। গাছটির পাশে একটা পাঁচিল ছিল। আবার পাঁচিলটার উপর টুকরো টুকরো কাচ বসানো ছিল। গাছে ওঠা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন পাঁচিলের উপর পড়ে গেল।

খবরটা পেয়ে শামশের সিংহ হাসপাতালে ছুটলেন। তিনি যখন

হাসপাতালে পৌছান তখন ছাত্রটি অপারেশনের টেবিলে। তার সঙ্গে ছেলেটির মা ও কাকিমার দেখা হলো। ছেলেটির মা জানায় যে ছেলেটির যদি আবারও দুর্ঘটনা ঘটে এই ভেবে তিনি ছেলেকে হকি খেলতে দিতে চান না। শামশের বোঝানোর চেষ্টা করেন চোট লাগা তো খেলাধুলার অঙ্গ। এর জন্য খেলাধুলা বন্ধ করাটা উচিত হবে না। সফল অস্ত্রোপচারের পর জ্ঞান ফিরতেই ছেলেটি চোখের সামনে মাকে দেখতে পেয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো —''মা, তুমি আমাকে হকি খেলতে আটকাবে না তো?''এই একটি মুহূর্ত বুঝিয়ে দেয় যে হকি ছেলেটির রক্তে রয়েছে, শিরা-ধমনী বেয়ে তা হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।

সেই ছেলেটিই অভিষেক নইন, চলতি প্যারিস অলিম্পিক গেমসে গতবারের জয়ী দল শক্তিশালী বেলজিয়াম এবং বরাবরের জন্য দুর্ধর্ষ দল অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণ ভেদ করে অন ফিল্ড খেলা থেকে দু-দুবার পরাজিত করে হকিপ্রেমী ভারতবাসীর হৃদয় জয় করার পাশাপাশি সমগ্র হকিবিশ্বে নজর কেড়ে নিয়েছে।

এইসবেরই ফলশ্রুতি গতবারের পর আরও একবার হকিতে ভারতের ব্রোঞ্জ পদক লাভ। টোকিয়োর পর প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের পুরুষ দলের ব্রোঞ্জ জয়। সেই ম্যাচে হরমনপ্রীত সিংহের করা জোড়া গোলে স্পেনকে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয়।

প্রথম কোয়ার্টারে কোনো দল গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের পেনাল্টি পায় স্পেন, ১৮ মিনিটের মাথায় অধিনায়ক মার্ক মিরালেস গোল করেন। ভারত পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোল শোধ করতে পারেনি। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ মুহূর্তে একটি পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। গোল করেন হরমনপ্রীত সিংহ। তৃতীয় কোয়ার্টারে অধিনায়কই দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। পেলাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন তিনি। ৩৩ মিনিটের মাথায় আবারও গোল করেন হরমনপ্রীত। এই গোলটিই ম্যাচের ফল নিশ্চিত করে। অলিম্পিক্সে হকি ভারতকে ১৩ তম পদক এনে দেয়।

চতুর্থ পদক জয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, ''আগামী প্রজন্মও এই পদক জয় উপভোগ করবে। অলিম্পিক্সে ভারতের হকি দল উজ্জ্বল ছাপ রেখে গেল। তারা ব্রোঞ্জ নিয়ে এল। পর পর দু'টি অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পেল ভারত। প্রতিভা ও দক্ষতার ছাপ রাখল খেলোয়াড়রা। শুভেচ্ছা সকলকে। হকির সঙ্গে ভারতীয়দের যোগ বহুদিনের। এই পদক জয় আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে।''

স্পেন ম্যাচের আগে ভারত জার্মানির বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ২-৩ গোলে হেরে যায়। সেই ম্যাচে খেলতে পারেননি অমিত রুইদাস। কোয়ার্টার ফাইনালে তাকে লাল কার্ড দেখানো হয়েছিল। সেই কারণে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রক্ষণাত্মক খেলোয়াড় ছিল না। এই ম্যাচটি বড়ো পার্থক্য তৈরি করে। গ্রুপ পর্বে নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল ভারত। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ড্র হয়। পরাজয় হয় বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে। কোয়ার্টার ফাইনালে গ্রেট ব্রিটেনকে হারিয়ে দেয় তারা। টাইব্রেকারে জিতেছিল ভারত। সেমিফাইনালে হারের কারণে ব্রোঞ্জের জন্য খেলতে হয়েছিল।

অধিনায়ক হরমনপ্রীত এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ''আজ আমাদের স্বপ্ন ভেঙে গেছে কিন্তু খালি হাতে ফেরার বদলে ব্রোঞ্জ নিয়ে ফেরা অনেক ভালো। গতবারও আমরা এই জায়গা থেকে ফিরে গেছি। আজকের দিনটা আমাদের জন্য ছিল না।'' সেমিফাইনালে হারের পর ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। তাই পদক জয়ের আনন্দ থাকলেও সোনা হারানোর যন্ত্রণা বুকে বিঁধছিল। দেশবাসীর কাছে এর জন্য ক্ষমাও চেয়ে নেন।

প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতীয় গোলরক্ষক পি আর শ্রীজেশের অনবদ্য পারফরমেন্স চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিপক্ষের কাছে শ্রীজেশ যেন মানব পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত ১৬ নম্বর জার্সি সংরক্ষণের সিদ্ধান্তের কথা গত ১৪ আগস্ট জানিয়েছে হকি ইন্ডিয়া। □

মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব রুখতে ভ্যাকসিন তৈরি তিন বাঙ্গালি বিজ্ঞানীর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কোভিড মহামারীর পর্ব কাটিয়ে গত ২-৩ বছরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল পৃথিবী। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আরও একটি মহামারীর সম্ভাবনা। গত ১৪ আগস্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা 'হু' মাঙ্কিপক্স বা এমপক্সকে গ্লোবাল হেলথ্ এমার্জেন্সি ঘোষণা করেছে। বিভিন্ন সংবাদসংস্থার খবর অনুযায়ী আফ্রিকার সীমা ছাড়িয়ে অন্যান্য মহাদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগ। 'হু'য়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ১১৬টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগের সংক্রমণ। মাঙ্কিপক্স সংক্রমণে মৃত্যুর হার ৩ শতাংশ। বিভিন্ন দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে উদ্বিগ্ন বিশ্বের স্বাস্থ্য মহল। মাঙ্কিপক্স-জনিত মহামারীর আশঙ্কার মধ্যেই দিল্লির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজির গবেষণাগারে মাঙ্কিপক্স প্রতিরোধী এই ভ্যাকসিন ডিজাইন করেছেন বাঙ্গালি বিজ্ঞানী ড. তন্ময় মজুমদার। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ইন ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট ল্যাবের প্রধান তন্ময়বাবুর সহযোগী রয়েছেন কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানিমাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. রাকেশ কুণ্ডু।

ড. রাকেশ কুণ্ডু

ড. সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

ড. তন্ময় মজুমদার

বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতে এই প্রথম মাঙ্কিপক্সের টিকা বা ভ্যাকসিন ডিজাইন করা সম্ভব হলো। জীবদেহের অভ্যন্তরে মিউটেশনের মাধ্যমে মাঙ্কিপক্সের ভাইরাস নতুন স্ট্রেইন তৈরি করে। এই ভাইরাসের মিউটেট করার হার খুব দ্রুত। তাই এই রোগ প্রতিরোধ বেশ কঠিন। এই ভ্যাকসিন মাঙ্কিপক্স প্রতিরোধে কার্যকরী হবে বলে বিজ্ঞানীদের দাবি। এই ভ্যাকসিনটি মানবদেহে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে তুলবে বলে আশাবাদী বিজ্ঞানীরা।

কোভিড পর্ব অতিক্রম করে যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে গোটা বিশ্ব, তখন ২০২২ সালে আফ্রিকার কঙ্গোতে মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। গত দু'বছরে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই ভাইরাসের সংক্রমণ। এই মহাদেশের বহু মানুষ এই ব্যাধিতে বর্তমানে আক্রান্ত। সম্প্রতি আমেরিকা ও ইওরোপে ছড়িয়েছে সংক্রমণ। এই রোগে আক্রান্তদের প্রথম দিকে মাথা ব্যথা, জ্বর, প্রদাহ হয়ে সারা শরীরে র‍্যাশ বেরোনোর মতো উপসর্গ দেখা দেয়। ধীরে ধীরে তা জটিল আকার ধারণ করে। প্রাণী থেকে মানুষে সংক্রামিত হওয়া এই রোগটি একটি জুনোটিক ডিজিজ। এমনকী মানুষ থেকে প্রাণীতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ভাইরাস। এই রোগটি একটি কনট্যাক্ট ডিজিজ বা ছোঁয়াচে রোগ, অর্থাৎ আক্রান্ত রোগী বা প্রাণীদের কাছাকাছি এলে এই রোগে সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বর্তমানে সংক্রমণ রুখতে জরুরি ভিত্তিতে দু'টি ভ্যাকসিনকে 'হু' ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। যদিও এই টিকা দুটি এর আগে স্মল পক্সের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই টিকাগুলি মাঙ্কিপক্সের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম বলে বিজ্ঞানী মহলের দাবি।

বিভিন্ন দেশে মাঙ্কিপক্সের টিকা তৈরির লক্ষ্যে গবেষণা চলছে। ভারতে এই সংক্রান্ত গবেষণায় মিলেছে অভাবনীয় সাফল্য। একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে সম্প্রতি এই তিন ভারতীয় বিজ্ঞানীর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। মাঙ্কিপক্সের ভাইরাসের বহিরাবরণটি ছ'টি মেজর গ্লাইকোপ্রোটিন দিয়ে গঠিত। সেই ছ'টি গ্লাইকোপ্রোটিনের এপিটোপকে চিহ্নিত করে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই ভ্যাকসিনটি তৈরি করেছেন। তাঁদের দাবি, জিনগত মিউটেশনের মাধ্যমে ভাইরাসের পাঁচটি এপিটোপের রাসায়নিক গঠন ও চরিত্র পরিবর্তিত হলেও ছ'নম্বর এপিটোপ দেখেই ভাইরাসকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হবে ভ্যাকসিনটি। এর পাশাপাশি এই টিকা মানবদেহে মাঙ্কিপক্সের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে তুলবে। এই টিকা মানব শরীরে তৈরি করবে লং-লিভড্ টি-লিম্ফোসাইট কোষ বা মেমরি টি-সেল। টিকা নেওয়ার পর বহু বছর ধরে এই কোষগুলি শরীরে জীবিত ও সক্রিয় থাকবে। ফলে বহুদিন পর শরীরে মাঙ্কিপক্সের ভাইরাস ঢুকলেও এই মেমরি টি-সেলগুলি— বি-লিম্ফোসাইট কোষ বা বি-সেলগুলিকে সক্রিয় করবে। সক্রিয় হয়ে ওঠা বি-সেলগুলি তখন ভাইরাল অ্যান্টিজেন দমনে প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি তৈরি করে দেবে। কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন— 'বিশ্বে এই প্রথম মাঙ্কিপক্সের উপর কাজ করে ভ্যাকসিনের ডিজাইন প্রস্তুত করা সম্ভব হলো। এর আগে স্মল পক্সের উপর প্রয়োগ করা ভ্যাকসিন ব্যবহার করা চলছিল যা ১৮ বছরের নীচের কাউকে দেওয়া যেত না। আমাদের তৈরি ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে বয়সের তেমন কোনো সীমারেখা থাকবে না'।

মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাবের দরুন পৃথিবী যখন আগামীদিনে এক সম্ভাব্য মহামারীর সম্মুখীন, সেই সময় দাঁড়িয়ে তিন বাঙ্গালি বিজ্ঞানীর এই অনন্য আবিষ্কার মাঙ্কিপক্স প্রতিরোধের মাধ্যমে বহু মানুষকে সুস্থ ও নীরোগ রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। জৈব প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় উদ্ভাবনী শক্তির স্বাক্ষর হলো নতুন এই আবিষ্কার। জৈব প্রযুক্তি গবেষণার প্রতি সমস্ত তরুণ বিজ্ঞানীদের নিশ্চিত ভাবে আকৃষ্ট করবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই কাজ। □

কাজের মন্ত্র

কুসুমপুর গ্রাম একসময় কাঠের কাজের জন্য খুব বিখ্যাত ছিল। সেখানে

রামবাবুর কারখানায় প্রচুর লোক কাজ করত। কোনোখানে কাঠ চেরাইয়ের কাজ, আবার কোনোখানে নকশা করার কাজ চলে। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। বিমল, রতন এরা বহুবছর ধরে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনার কাজ করে। বহুদিন ধরে কাজ করলেও তাদের বেতন তেমন বাড়ে না। একটা গাছকে ভালো মতো কেটে কারখানা পর্যন্ত পৌঁছাতে তাদের দুই-তিনদিন লেগে যায়।

সেবার হঠাৎ করে আসবাবপত্রের চাহিদা বেড়ে যায়। রামবাবু তাই কাঠকাটার জন্য অল্পবয়সি আরেকটি ছেলেকে কাজে লাগান। ছেলেটার নাম নবীন। বয়স খুব বেশি হলে আঠারো-উনিশ হবে। ওর বাবাও আগে এই কাজই করতো। শরীর অসুস্থ হওয়ায় এখন আর পারে না, তাই নবীনই সংসার চালানোর জন্য বাবার পেশাটাকে ধরেছে। কাজ শুরু করেই মালিকের নজরে পড়ে গেছে। যে কাজ বিমল আর রতন এক সপ্তাহে শেষ করে, নবীন একা সেই কাজ চার-পাঁচ দিনে করে ফেলে। তাই কিছুদিনের মধ্যেই মালিক তার বেতন বাড়িয়ে দেয় আর পুরো কাজের দায়িত্ব তার উপর দেয়। পুরানো দু'জন নবীনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমরা তো এত বছর ধরে কাজ করছি তবুও তো তোর মতো পারছি না, তোর কুড়োলটি কী দিয়ে তৈরি বলতো।'

নবীন মুচকি হেসে বলে, 'কুড়োল তো তোমাদের যেমন আমারও তেমন।'

'তাহলে কীভাবে তুই এত অল্প সময়ে এত বেশি কাজ করতে পারিস, সেটাই তো আমাদের মাথায় ঢুকছে না।'

নবীন জিজ্ঞেস করে, 'কাকা, তোমরা কেমন করে কাজ করো বলতো, শুনি।'

তারা বলে, 'সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কাজ করি আর দুপুরে ঘণ্টাখানেকের জন্য খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম।'

নবীন বলে, আমিও তো তাই-ই করি। কিন্তু বাবা আমাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছে তার জন্যই আমার কুড়োল দিয়ে বেশি গাছ কাটা যায়।'

দু'জনেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী মন্ত্র? আমরা তো মন্ত্র আছে বলে কোনোদিন শুনিনি। আমাদেরকে বল না রে।'

নবীন তখন মুচকি হেসে তার বাবার শেখানো একটা ছড়া বলে—

বিশ্বকর্মা ঠাকুর থাকেন
তারই সহায়,
যন্ত্রপাতি যার যত্নে থাকে
সকল সময়।
কাজের মধ্যে আরাম করো
তারই মাঝে কাজ,
কাজটি তার আগেই ফুরায়
হওয়ার আগে সাঁঝ।

তোমরা যখন আরাম করো, তখন আমিও আরাম করি। কিন্তু আরাম করার সময় আমি আমার কুড়ালটাতে নিয়মিত ধার দিতে থাকি। তাই তোমাদের থেকে আমার কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। মনে রেখো, নিজের নিজের কাজের জিনিসগুলো যত্ন করে রাখলে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়।

সোমকান্তি

জাতীয় উদ্যান

জলদাপাড়া

আলিপুরদুয়ার জেলায় পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৬১ মিটার উচ্চতায় তোর্ষানদীর তীরে এই অভয়ারণ্যের মোট আয়তন ১৪১ বর্গকিলোমিটার। এই অভয়ারণ্যের প্রধান আকর্ষণ এশীয় একশৃঙ্গ গণ্ডার। এখানে বসবাসকারী বন্যপ্রাণীগুলি হলো বাঘ, হাতি, সম্বর হরিণ, মায়া হরিণ, চিতল হরিণ, হগ ডিয়ার, বুনো শুয়োর ও গৌর। পাখির মধ্যে বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান, ক্রেস্টেড ঈগল, পালাসা'স ফিশিং ঈগল ও শিরকা। এছাড়াও বনমোরগ, ময়ূর, তোতা, লেসার পেইড হর্নবিল প্রভৃতি।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৩৯

ক্রিয়াপদপ্রয়োগ: —বর্তমানকালে মধ্যমপুরুষে লট্—আদেশ ও প্রার্থনায়

ভবান্ গচ্ছতু। (পুং) আপনি যান/তুমি যাও।

ভবতি গচ্ছতু। (স্ত্রী) আপনি যান/তুমি যাও।

অভ্যাস করি—

ভবান্ আগচ্ছতু (আপনি আসুন/তুমি এসো)।

ভবতি আগচ্ছতু (আপনি আসুন/তুমি এসো)।

ভবান্ খাদতু। ভবতি পিবতু।

ভবান্ হসতু। ভবতি নৃত্যতু।

ভবান্ উত্তিষ্ঠতু। ভবতি উপবিশতু।

প্রয়োগ করি—

এভাবে ভবান্, ভবতি দিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে।

....পঠতু। .... লিখতু। .... গায়তু। .... পশ্যতু।

ভালো কথা

ব্যাং

আমাদের বাড়ির একটি ঘর ঘেঁসে একটি ডোবা আছে। সন্ধ্যেবেলা ওই ডোবা থেকে চার-পাঁচটি সোনাব্যাং আমাদের উঠোনে উঠে আসতো। ছোটোবেলা আমরা ওগুলোকে মারার জন্য তাড়া করতাম। ঠাকুমা তখন ধমক দিয়ে বলতেন, ওরা উপকারী জীব, ওদের মারতে নেই। শুধু ওদের নয়, কোনো জীবকেই মারতে নেই। এখন আমি বড়ো হয়েছি। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। একদিন দেখি, সন্ধ্যায় ছটি সোনাব্যাং ঘরের মধ্যে এসেছে। মশা আর ছোটো ছোটো পোকা ধরে খাচ্ছে। আমি একমনে দেখছিলাম আর ঠাকুমার কথা ভাবছিলাম। ঠাকুমা তো ঠিকই বলেছিলেন। তখনই ঠাকুমা ঘরে ঢুকে বললেন, কী, আমি ঠিক বলেছিলাম তো?

রেখা মাহাত, ষষ্ঠশ্রেণী, করদহ, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

রাত্রিবেলার পাখি

আত্মদীপ মিশ্র, দ্বিতীয় শ্রেণী, জিলা পাবলিক স্কুল, তমলুক।

আমি হলাম রাত্রিবেলার পাখি,
সবার আগে আমি যাই তাদের কাছে
আর বলি, 'কেমন আছো?'
তারা বলে, 'ভালো আছি।'
আবার আমি বলি, 'আমি কে?'
তারা বলে, 'তুমি পেঁচা।'

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

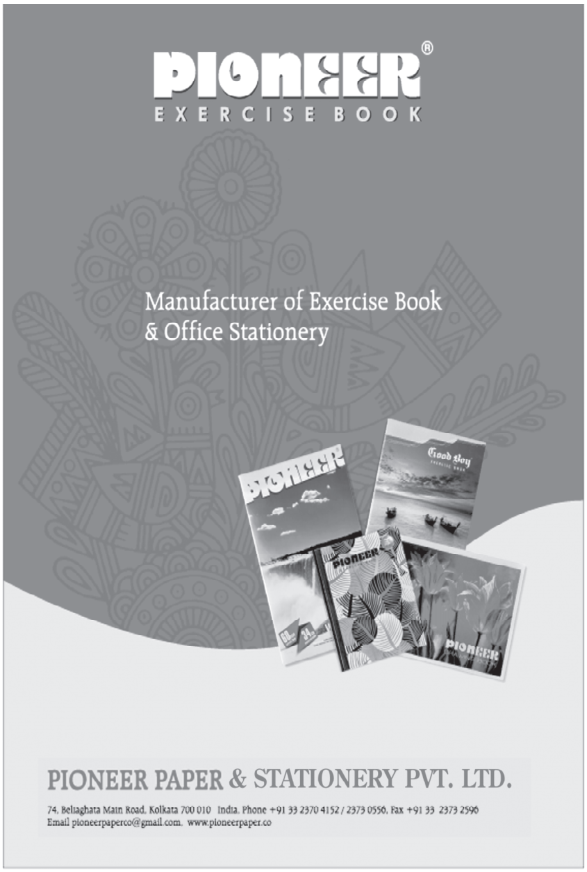

With Best Compliments from -

A

Well wisher

স্বামীজীর বিশ্বজয়ের নেপথ্য এবং তৎকালীন কলকাতার প্রতিক্রিয়া

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

তিনি যুগপুরুষ। ভারতবর্ষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও কালোত্তীর্ণ ঐতিহ্যকে বিশ্বাঙ্গনে উজ্জ্বল করার প্রয়াসে তিনি এক আলোকিত মহাত্মা। নিজের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মকে বিশ্বের দরবারে এমন সম্মানিত আর কেউ করেননি কখনো। অসম্ভব প্রাজ্ঞতা নিয়ে প্রচার করেছেন হিন্দু ধর্মের গৌরবকথা। দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেছেন, এই ধর্মই সারা জগৎকে শিখিয়েছে সহিষ্ণুতা এবং সব মত ও পথকে সত্য বলে বিশ্বাসও করে। তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন, নিজের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে নিজ ধর্ম পালন করেও কীভাবে অন্য মত ও পথকে মর্যাদা দিতে হয়। একটি ধর্মের অনুসারী হয়েও মানুষ কীভাবে নিজেকে বিশ্বজনীন ধর্মের উন্মুক্ত আঙিনায় মেলে ধরতে পারে, হয়ে উঠতে পারে বিশ্ব নাগরিক। ভবিষ্যতের এক স্বপ্ন বীজ বপন করে গেছিলেন সেদিন; যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তা দেশ বা কালে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সেই ধর্মে থাকবে সব মত ও পথের নির্যাস কালজয়ী দর্শন, তা ব্যস্ত হবে বিশ্বসমাজ উন্নয়নের সীমাহীন আকাশে। তাতে হিন্দুধর্মের ভূমিকা থাকবে সর্বাগ্রে।

১৮৯৩ সালে মার্কিন দেশের শিকাগো শহরে ঐতিহাসিক ধর্ম মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছর পূর্তি উদ্‌যাপন— অফিসিয়াল নাম ‘কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন’। ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এই মহাসম্মেলন চলছিল ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ধর্ম মহাসভার অধিবেশনের দুটি ভাগ ছিল— একটি মূল শাখা ও অপরটি বিজ্ঞান শাখা। ঘোষণাপত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন মত ও পথের সাধারণ সত্য অনুধাবন, প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলির পরস্পরকে আলোকিত করার মৌলিক রাস্তা খোঁজা, ধর্মের আলোকে অশিক্ষা-দারিদ্র থেকে মুক্তির রাস্তা অনুসন্ধান এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করা প্রভৃতির মতো বিষয় উল্লেখ থাকলেও অস্বীকার করার উপায় নেই খ্রিস্ট মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই ছিল এই আয়োজনের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা এই ধর্মমহাসম্মেলন স্বামীজী মোট ১২টি বক্তৃতা করেছিলেন। যদিও স্বামীজীর রচনাবলীতে মাত্র ছ'টি বক্তৃতা মুদ্রিত আছে। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার ধর্মমহাসভার প্রথম দিনে দেওয়া স্বামীজীর মাত্র কয়েক মিনিটের সেই বক্তৃতা সারা আমেরিকাবাসীর কাছে স্বামীজী, হিন্দু ধর্ম এবং ভারতবর্ষকে অভাবনীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, আলোকিত করেছিল অপার বিস্ময়ে।

ফ ঃ ৬

এই বক্তৃতা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ছোটো এবং সবচেয়ে শক্তিশালী বক্তৃতা নিঃসন্দেহে। বক্তৃতার প্রারম্ভে সেই ঐতিহাসিক আহ্বান 'সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অব আমেরিকা' (খেয়াল করতে হবে 'ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স নয়, আগে 'সিস্টার্স')। সরাসরি রামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ না করেই এই বক্তব্যে স্বামীজী মূলত শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' বাণীর মর্মার্থকে উপস্থাপন করেছিলেন সারা বিশ্বের কাছে। তাঁর বক্তব্যে নিজ ধর্ম হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠাতার মাধ্যমে আগামী মানব সভ্যতায় এক দৃপ্ত পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন— সব মত ও পথই সমান। মানব বিকাশের প্রাচীনতম পরম্পরা বহন করা ভারতবর্ষের মানুষের এই সনাতন বিশ্বাসকেই সকলের সামনে উপস্থাপন করেছেন, অসাধারণ বাগ্মিতায়।

তবে তাঁর এই বিশ্বজয়ের পথ সহজ ও মসৃণ ছিল না মোটেই। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চরম অনিশ্চয়তা আর অসংখ্য অসম্মান মাথায় নিয়েও নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে। পরম করুণাময় ঈশ্বর তাঁর একমাত্র ভরসা, এগিয়ে চলার সকল শক্তির উৎস। স্বামীজীর নিজের কথায়, ঈশ্বরের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন তিনি এবং ঈশ্বরই এই সাফল্যের যাত্রাপথ সূচিত ও নিশ্চিত করেছেন।

১৮৯৩-সালের ৩১ মে 'পেনিনসুলার' জাহাজে করে বোম্বে থেকে আমেরিকার দিকে রওনা দিলেন। শিকাগোয় পৌঁছলেন ৩০ জুলাই রবিবার মাঝরাতে। সম্পূর্ণ অপরিচিত বান্ধবহীন পাশ্চাত্যের এক নগরীতে। এই ধর্ম মহাসভায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রাথমিক ও সবচেয়ে জরুরি ছিল একটি পরিচয়পত্র, সেটাই তাঁর কাছে ছিল না। যৎসামান্য সঞ্চয় যখন নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম, ব্যয় সংকোচনের প্রত্যাশায় ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের বোস্টন শহরের দিকে রওনা হলেন। চলার পথে ট্রেনে পরিচয় হলো ক্যাথেরিন স্যানবার্নের সঙ্গে। স্বামীজীর বিশ্বজয়ের এই অভিযানে এক আলোকিত বিদেশি রমণী। তাঁর বাড়িই কলকাতার নরেনের থাকা-খাওয়ার নিশ্চিত আশ্রয় হয়ে গেল।

আমেরিকার সঙ্গে পরিচয়ের রাস্তাও সেখান থেকেই উন্মোচিত হতে থাকলো ধীরে ধীরে। বিভিন্ন গির্জা ও ক্লাবে ছোটো ছোটো বক্তৃতা করতে থাকলেন ভারতবর্ষের এই 'সন্ন্যাসী রাজা'। তাঁর বক্তৃতার খবর সেখানকার সংবাদপত্রে প্রচার হতে থাকলো গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই স্যানবর্নের মাধ্যমেই পরিচয় হয়ে গেল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেনরি রাইটের সঙ্গে, যিনি তৎকালীন মার্কিন মুলুকে প্রভাবশালী সুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন। স্বামীজীর প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন তিনি; চিঠি লিখলেন মহাসভা উদ্‌যাপন কমিটির উদ্দেশ্যে, পরিচয়পত্র ছাড়াই স্বামীজীকে ধর্ম মহাসম্মেলন অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে হেনরি রাইটের স্বামীজীকে অনুভব করা সেই বিখ্যাত উক্তি 'আপনার (স্বামী বিবেকানন্দ) কাছে পরিচয় পত্র চাওয়ার অর্থ হলো সূর্যকে প্রশ্ন করা যে তার কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কিনা'।

বোস্টন থেকে স্বামীজী শিকাগোয় পুনরায় ফিরে এলেন ৯ সেপ্টেম্বর। আবারও সমস্যার সম্মুখীন হলেন ধর্ম মহাসভা ঢুকতে গিয়ে। এবারও আর একজন বিদেশি রমণী তাঁকে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণে সাহায্য করলেন, তিনি মিসেস জর্জ ডব্লিউ হেল। এই পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকে যায় আজীবন।

প্রথম দিনের বক্তৃতাই স্বামীজীকে সারা আমেরিকায় তুমুল জনপ্রিয় করে তুলল। আমেরিকার প্রায় সব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলো তার তেজোদ্দীপ্ত ছবি আর উচ্চ প্রশংসা। কোনো পত্রিকা লিখল--- 'ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ অবিসংবাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি'। কোনোটি লিখল— 'তিনি শুধু মঞ্চের একদিক থেকে অপর দিকে হেঁটে গেলেই হাততালি পেয়ে থাকেন।' প্রথম দিনের পর থেকেই ভবিতব্য হয়ে গেল, স্বামীজীর বক্তব্য সবার শেষে হবে।

তাঁর ওই শেষের ১৫ মিনিটের বক্তব্যের জন্য জনসাধারণকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখার কৌশল নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ।

তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ ও গভীরতা পরে কখনো আলোচনা করা যাবে। এখন বরং খোঁজ নেওয়া যাক, যে মানুষটি পাশ্চাত্যের আমেরিকার মতো দেশের সুশিক্ষিত জনগণের মধ্যে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন, জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে সক্ষম হয়েছিলেন— ঠিক সেই সময় কলকাতা হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়া কী ছিল। বিষয়টি নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত কৌতূহলের।

তখন তো এ বিপুলা পৃথিবী ভুবনগ্রামে পরিণত হয়নি যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে। তাই সুদূর আমেরিকায় তোলপাড় ফেলে দেওয়া কলকাতার নরেন, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া খুব উজ্জ্বল হওয়া সম্ভাবনা কম স্বাভাবিক কারণে। সে প্রসঙ্গ অন্য।

তবে সব সফল প্রতিভাকে কালিমালিপ্ত করার সামাজিক ব্যাধি স্বয়ং বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হওয়ার দাবি ঘোরতর অন্যায় হবে। স্বামীজীর এই সাফল্যকে খাটো করা ও কলুষিত করার জন্য কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত 'শিক্ষিত অগ্রগণ্য' মানুষের ভূমিকা ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়। মূলত চার গোষ্ঠীর মানুষ এই কাজে লিপ্ত ছিলেন বেশি করে।

● তৎকালীন খ্রিস্টান মিশনারি, যারা ভারতে খ্রিস্টমত প্রচারক হিসেবে কাজ করছিলেন। ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করার জন্য সেই সময়ে প্রতি জন পিছু পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার মার্কিন ডলার পেতেন তাঁরা। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় আমেরিকাবাসীকে বুঝিয়েছিলেন ভারতবর্ষ অধ্যাত্মের পুণ্যভূমি, উচ্চ আদর্শ তার সনাতন শিক্ষায়; এখানে তাই মিশনারির প্রয়োজন নেই, বরং তুমুল দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করা মানুষগুলোর খাদ্য ও শিক্ষা প্রয়োজন সবার আগে। ধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর সফল ঘোষণার পর ইতিহাস সাক্ষী, মিশনারিদের এক বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ কমে গিয়েছিল।

● প্রকট ছিল তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের একটি গোষ্ঠীর নীতিহীন বিরুদ্ধতা। ব্রাহ্মদের প্রতিনিধি হিসেবে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলন উপস্থিত ছিলেন কলকাতার একজন। তিনি প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার। কলকাতায় ফিরে এসে স্বামীজীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কুৎসা এই মানুষ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা করেছিলেন নিরন্তরভাবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহা সম্মেলনের পর হিন্দুধর্মের পৌত্তলিক জাগরণের বিপুল সম্ভাবনাকে যেনতেনপ্রকারে

আটকানো। খ্রিস্টান পাদরিরা এই কাজে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন ভিতর থেকে। তবে ইতিহাস এ কথাও স্মরণ করে, ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের হাতে দীর্ঘ অভিনন্দনপত্র বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন।

● ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এবং তাদের আধিপত্য অটুট রাখার লালসায় ব্রাহ্মণ নয় এমন একজন সন্ন্যাসী হিন্দু ধর্মের বিশ্ব প্রতিনিধি হবেন, এটা মেনে নিতে পারেননি তৎকালীন শিক্ষিত ব্রাহ্মণরা। তাই কলকাতার ব্রাহ্মণ সমাজ স্বামীজীর বিরুদ্ধে নেমেছিল নগ্নভাবে।

● দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, স্বামীজীর অনেক গুরুভাই তাঁর বক্তব্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন প্রাথমিকভাবে। তাদের অভিযোগ ছিল, শিকাগো বক্তব্যে স্বামীজী কেবল নিজেকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন আমেরিকায় গিয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম একবারও উচ্চারণ করেননি। যদিও অচিরেই তাঁদের সেই ভ্রান্তি দূর হয়েছিল।

স্বামীজীর শিকাগো বিশ্বজয়ের সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল কলকাতা ও মাদ্রাজে। কলকাতার অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। বহু শিক্ষিত প্রভাবশালী কলকাতার ভদ্রমণ্ডলী এই সংবর্ধনা নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। প্রশ্ন তুলেছিলেন কায়স্থ কিংবা শূদ্রর সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার শাস্ত্র দেয় কিনা, কিংবা হিন্দু সন্ন্যাসীর ম্লেচ্ছ দেশে ভ্রমণ হিন্দুশাস্ত্রকেই কলুষিত করেছে কিনা। পরবর্তীকালে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি হতে সম্মত হয়েছিলেন, আমেরিকার সংবাদপত্রে স্বামীজীর প্রশংসাসূচক লেখা তাঁকে দেখানোর পর। কিন্তু স্বামীজীর বিশ্বজয়ের সংবর্ধনা সভার সভাপতি সেই প্যারীমোহন স্বামীজীকে 'স্বামী বিবেকানন্দ' বলতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁকে 'ব্রাদার বিবেকানন্দ' বলেই বহুবার সম্বোধন করেছিলেন সেদিনের সভায়। কারণ সারা বিশ্বের কাছে হিন্দুধর্মের প্রধানতম প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত এই সন্ন্যাসী 'ব্রাহ্মণ' নয়, ছিলেন 'কায়স্থ'।

'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা তখনকার হিন্দু সমাজের হীন মানসিকতার আরেকটি স্বাক্ষর বহন করে— 'It was a sight to see a Brahman presiding at a meeting, called for honouring a Sudra.' অথচ ঐতিহাসিক সত্য হলো, স্বামীজীর বিশ্ব জয়ের অভূতপূর্ব এই ঘটনার সানন্দ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে যথাযথ সম্মাননা প্রদর্শন করেছিল গোটা দক্ষিণ ভারত।

পরাধীন আত্মবিস্মৃত হীনম্মন্যতায় নিমজ্জিত গোটা ভারতবাসীকে সারা বিশ্বের কাছে আলোকিত করার এবং জাতিকে আবার নতুন করে গর্ববোধ করার অনুপ্রেরণা এনে দিয়েছিলেন 'যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। 'বসুধৈব কুটুম্বকম'— ভারতবর্ষের এই শাশ্বত বাণীকে প্রতিষ্ঠা করে আত্মীয়তায় বেঁধেছিলেন সারা পৃথিবীকে, জয় করেছিলেন বিশ্ব। নিজের ধর্ম, নিজের পুণ্যভূমিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার এক প্রজ্বলিত মশাল হাতে হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন, সারা দেশকে দিয়েছিলেন আত্মমর্যাদায় উদ্দীপিত হওয়ার এক আশ্চর্য অনুভূতি। সেই মানুষটিকে এবং তার ধর্ম ভাবনাকে আজকের ধর্মোন্মত্ত পৃথিবীতে আরও বেশি করে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তাকে গভীরভাবে অনুভব করার নিরন্তর অনুশীলনই আগামীর পথ তৈরি করবে বিশ্ব শান্তি আয়োজনে। ভারত জগৎ সভায় একদিন প্রধান পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে নিশ্চিতভাবে এবং তা যে স্বামীজীর দেখানো পথে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেই অনাগত দিনের অপেক্ষায় সমগ্র ভারতবর্ষ। স্বামীজীর দেখানো পথকে অনুসরণ করার প্রতিজ্ঞাই সেই আকাশ দেখার মুক্ত জানালা হোক।

তথ্যসূত্র :

১. স্বামী বিবেকান্দ বাণী ও রচনা--- উদ্বোধন।

২. পরিব্রাজক স্বামীজী দেশে ও বিদেশে— রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।

৩. তব কথামৃত— স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

৪. বাঙ্গালির অনতিঅতীতচারণ--- দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত।

৫. পত্রপত্রিকা।

শিবরামের আত্মজীবনীই আসলে শিব্রামের জীবনী

স্বপন কুমার মণ্ডল

রসসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী (১৩.১২.১৯০৩- ২৮.০৮.১৯৮০) তাঁর আত্মজীবনী 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'য় (বই আকারে ১৯৭৪) যেভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাতে মালদার চাঁচল থেকে কলকাতায় এসে মুক্তারাম স্ট্রিটে বসবাসের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে মেসজীবনের কথাও উঠে এসেছে, কিন্তু তখনও কলকাতায় তাঁর জীবনের পরিচয় অসম্পূর্ণ ছিল। এজন্য 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এ (বই আকারে ১৯৯৬) সেই কলকাতার জীবনের কথায় ফিরে এসেছেন। এ বিষয়ে সচেতনতাও লক্ষণীয়। প্রথম অধ্যায়ের সূচনাতেই তিনি জানিয়ে দেন : 'পুরনো পোড়োবাড়ির খপ্পর থেকে কলকাতায় ফুটপাতে গিয়ে পড়লাম। সেখান থেকে উঠলাম এসে মুক্তারামের মেসে--- মালদহের তথাকথিত এক রাজপ্রাসাদ থেকে চোরাবাগানের এই বামালদাহে।' শুধু তাই নয়, 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'কে ঘুরিয়ে নামকরণের বিষয়ে শিবরাম পাঠককে সচেতন করে তুলেছেন। আত্মজীবনের সূচনাতে যেভাবে তিনটি শব্দ দিয়ে নামকরণের ব্যাখ্যায় শামিল হয়েছিলেন, এখানেও তার পরিচয় বর্তমান। 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে তিনি পুনরায় সেই ব্যাখ্যায় শামিল হয়েছেন যাতে পাঠকমনে অস্পষ্ট ধারণার অবকাশ তৈরি না হয়। তাতে এটি যে তাঁর উপন্যাস নয়, আত্মজীবনী, তাও স্পষ্টতা লাভ করে। তাঁর কথায় : 'ঈশ্বর থেকে পৃথিবীতে এলাম— পৃথিবীকে পেলাম। পৃথিবীর পরিচয়ে ভালোবাসাকে আনলাম। স্বাদ পেলাম ভালোবাসার'।

আবার ভালোবাসার থেকে পৃথিবীর পরিচয়ে ঈশ্বরকে চেনা— স্নেহের পরিচয় পাওয়া তাঁর। কখনো রথ, কখনো-বা উলটোরথ। কিন্তু একই পথ— একটাই গৎ— অনন্য গতি।' অর্থাৎ সেই উলটোপথে শিবরাম আবার প্রথম অবস্থানে ফিরে আসতে চেয়েছেন। জীবনচক্রের সাধারণ নিয়মে শুরু ও শেষের সঙ্গতিবিধানে তাঁর আঙ্গিক সচেতনতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আপাতভাবে শিবরামের আত্মজীবনীটি অগোছালোভাবে উপস্থাপিত হলেও তার মধ্যে তাঁর বিন্যাসভাবনায় শিল্পীসুলভ সচেতনতা বর্তমান। 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'য় রিনির ভালোবাসায় শিবরামের প্রকৃতি সবুজ হয়ে উঠেছে। 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এ বস্তির শিব্রামীয় ভাষায় শ্রাবস্তীদের অর্থাৎ নানু, লালি প্রভৃতিদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সাহচর্যের কথা উঠে এসেছে। অবশ্য কৈশোরের সঙ্গিনী রিনির কথাও স্মরণ করেছেন শিবরাম। আর তা করেছেন তাঁর জীবনে একান্তভাবেই তার অবিকল্পতায়। অন্যদিকে চাঁচল রাজপরিবারের কথাতেও ফিরে গিয়েছেন তিনি। আর তা গিয়েছেন প্রয়োজনে নয়, আয়োজনের আড়ম্বরে। আসলে শিবরামের ঘটনাবহুল জীবনটাই আকস্মিকতার আড়ম্বরে পূর্ণ। সেই আকস্মিকতায় শুধু বিস্ময়কর পরিসরই নেই, ব্যক্তিক পরিচয়ে অন্য মানুষের অনন্য প্রকৃতিও সুরভিত হয়ে ওঠে। শিবরাম তাঁর সেই ব্যক্তিগত জীবনের কথাই শিব্রামীয় পরশে উপাদেয় করে তুলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এ 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'র কল্পিত সাংবাদিক জনাব সাহেবকে উপস্থিত করা হয়নি। অথচ তাতে শিব্রামীয় সংলাপের অবকাশ বর্তমান। ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের পরিসরে তার সক্রিয়তা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে।

অন্যদিকে শিবরামের আত্মজীবনীর আগে তাঁর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের স্মৃতিকথায় নানা বিষয়ের অবতারণা উঠে এসেছিল। শুধু তাই নয়, তাঁকে নিয়ে ভবানী মুখোপাধ্যায় যে রীতিমতো কল্পনার রং মিশিয়ে গল্প ফেঁদেছিলেন, সেকথা তিনি 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'য় প্রকট করে তুলেছেন। সেদিক থেকে সেসব স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে ভ্রান্তি নিরসন করার দায় আত্মজীবনীতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রেও 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এর ভূমিকা বর্তমান। শিবরাম অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে রিনির সঙ্গে জেল খেটেছেন। আবার সেই উত্তপ্ত পরিসরে স্বসম্পাদিত নবপর্যায় 'যুগান্তর'-এ রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'র প্যারডি রচনা করে

রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে। সেকথা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় চাঁচলের রাজা শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরীর রোষে পড়ে শিবরামের পিতার মাসোহারা বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য শিবরাম সেই রাজার বিরুদ্ধে তাঁকেই সাক্ষী করে হাইকোর্টে একটি আজব মামলা করেছিলেন। সেই মামলা জিতলে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যালাভের মতো রূপকথা ভিড় করে এসেছিল মামলাকারীর মনে। সেই লাখটাকা প্রাপ্তিবোধে এলিট সিনেমায় বসে শিবরাম তাঁর নতুন বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়ে 'পৃথিবী ভ্রমণ'-এ মুখর হয়ে ওঠেন। প্রেমেন্দ্রের সেই স্মৃতিকথা (১৯৬০-এর 'জাগৃহি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমার বন্ধু শিব্রাম') শিবরাম 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এ উদ্ধৃত করেছেন।

সেই আজব মামলার ইতিবৃত্ত বলতে গিয়ে তাঁকে চাঁচলের রাজার কথায় ফিরে যেতে হয়েছে যা তাঁর জীবনকে জানার ক্ষেত্রে অপরিহার্য মনে হয়। পাশাপাশি 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'য় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শিশির ভাদুড়ীর তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকজীবনে শিবরামের ঘনিষ্ঠজনদের সুমধুর পরিচয় তখনও বাকি। সেদিক থেকে বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুজফ্‌ফর আহমদ, সৈয়দ মুজতবা আলি প্রমুখ কৃতী মানুষের সান্নিধ্যের কথা পরের খণ্ডে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ছেচল্লিশের 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ শিবরামের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাও কীভাবে শিব্রামীয় রঙ্গরসের আধার হয়ে উঠেছে, তার পরিচয়ও খণ্ডটিকে অপরিহার্য করে তুলেছে। অন্যদিকে সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বের প্রতি শিবরাম যে সম্পূর্ণ নির্মোহ হতে পারেননি, সে বিষয়টিও 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এ প্রতীয়মান। নিজের টাকায় প্রকাশিত বইগুলির তিনি পুনরায় শিব্রামীয় জনপ্রিয় পরিসরে ছাপতে চেয়েছিলেন। 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' (১৯৪৩) তারই পরিচয়। শুধু তাই নয়, প্রবন্ধের বইটির প্রতি শিবরামের যে সবিশেষ দুর্বলতা ছিল, সেকথাও জানা যায়। কলকাতায় প্রথম জীবনের হকারবন্ধুর স্মৃতিপথে সেই বইয়ের প্রতি তাঁর প্রত্যাশার কথা আকাঁড়া ভাবে উঠে এসেছে : 'আমার লগুড়ে মারা বিদ্যেও দেখবে। দেখতে পাবে। একটু অপেক্ষা করো। মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি লেখাগুলো বেরুক না বই হয়ে? তোমাদের গুরুদের কাউকে আর আস্ত রাখিনি--- শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু করে...।' শুধু তাই নয়, বন্ধুকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে শিবরাম আসলে মনের কথা বলে ফেলেছেন, 'আজকে না বুঝলেও পাঁচ দশ বিশ বছর বাদ আলবৎ আমি পাঠক পাব'। অথচ সেই শিবরামই প্রবন্ধের বইটির তৃতীয় সংস্করণ 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'র (১৩৫৯) ভূমিকায় রসিকতা করে বলেছেন, বইটি আসলে মস্কো নিয়ে পণ্ডিতি আর পণ্ডিচেরি নিয়ে মশকরা।

অর্থাৎ শিব্রামীয় পরিসরে শিবরামের আত্মগোপনের প্রয়াস সেখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অথচ আত্মজীবনীতে তাঁর পরিচয় স্ববিরোধিতার অবকাশ তৈরি করেছে। শুধু তাই নয়, লিখে প্রথম অর্থপ্রাপ্তির কথা নিয়েও শিবরাম পাঠককে স্ববিরোধিতায় ফেলে দিয়েছেন। সেই হকারবন্ধু রামকৃষ্ণকে তাঁর লিখে টাকা পাওয়ার কথায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠাটা তাই বিস্ময়কর হয়ে ওঠে : 'না, কাগজ বেচতে হয় না এখন আর। আমি এমন একটা কাগজের সম্পাদক...মাস গেলেই শ'খানেক টাকা পাই। সেটা আমার মাইনে। তার পরে এধারে ওধারে লিখেটিখেও দু-পাঁচ টাকা এসে যায়।' অথচ 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'তেই শিবরাম গল্পলেখার জন্য আগাম টাকা পাওয়ার মধ্য দিয়ে হাসির জগতে পদার্পণের কথা ফলাও করে বলেছেন। সেদিক থেকে 'মৌচাক' (১৯৩৫)-এ 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' গল্পটির সূত্রে প্রথম দক্ষিণা পাওয়ার বিষয়টি আপনাতেই প্রশ্নাতুর করে তোলে। তাঁর 'টাকা ছাড়া কেউ লেখে নাকি এ বাজারে'র প্রশ্নই সে প্রশ্নের সূচিমুখে উঠে আসে। ফলে 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড'র জন্যই শুধু নয়, শিবরামের সাহিত্যজীবনের দ্বিধাদীর্ণ প্রকৃতির মূলে পৌঁছানোর সূত্রাধার হিসেবেও অপরিহার্য মনে হয়।

জীবনের ব্যর্থতার সোপানে তার সাফল্যের বুনিয়াদটি ফিরে দেখার মধ্যে আভিজাত্যবোধের পরিসরটি আরও আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে শিবরাম তাঁর শিব্রামীয় রাজপথটি প্রদর্শনে যেভাবে জীবনের খানাখন্দমুখর কাঁকর বিছানো পদে পদে কণ্টকিত দুর্গমপথের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে যেমন সেই রাজপথের গরিমাবোধ সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে; স্বকীয় পথের স্বচ্ছন্দতার কথা তখনও বাকি। শুধু তাই নয়, জীবনে যা পেয়েছেন তাতেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন, যা পাননি, তা নিয়ে তাঁর কোনো আফশোস ছিল না। সেই সহজানন্দ প্রকৃতির আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছেন শিবরাম। অথচ সেই প্রাপ্তিযোগের মহত্ত্ব বিস্তারে তাঁর কোনো সক্রিয় উদ্যোগ নেই। খ্যাতনামা কৃতীজনদের পাশাপাশি বস্তির মানুষ থেকে ফুটপথের নিরন্ন অসহায় বন্ধুরাও সকলেই তাঁর অনাবিল জীবনের শরিক হয়ে উঠেছে। সেই অনামা-অচেনা মানুষের প্রাধান্য যেমন তাঁর অনন্যতাকে প্রকট করে তোলে, তেমনই তার আবেদনে উপন্যাসের আস্বাদ বয়ে এনেছে। শুধু তাই নয়, শিবরাম তাঁর 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এর শেষের দিকে ফুটপথের জীবনের স্মৃতিতে ফিরে গিয়েছেন।

সাধারণত আত্মজীবনী যেখানে সাহিত্যজীবনের সূচনা পর্বে। তখনও তাঁর সংবাদপত্র ফেরি করার সংযোগ মন থেকে মুছে যায়নি। সেই একদা একসঙ্গে ফেরি করা ফুটপথের বন্ধু মন্টু ওরফে রামকৃষ্ণর সঙ্গে শিবরাম তাঁর সংবাদপত্র হকারি করতে গিয়ে

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য।

যোগাযোগ :
৮৭৭৭৮১৬৪০০

লেখক থেকে সম্পাদক হওয়ার পরিকল্পনার কথায় ফিরে গিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে তাঁর আত্মজীবনীতে লেখকসত্তার উত্তরণের পরিচয়ের অভাববোধে ও আকস্মিক সমাপ্তিচেতনায় 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এর ভূমিকাটি পাঠকমানসকে প্রশ্নশীল করে তোলে। অথচ একটু সচেতনভাবে দেখলে সেই প্রশ্নের উত্তর তাতেই লক্ষ্য করা যায়। শিবরাম স্বকীয় সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে আত্মসচেতন ছিলেন বলেই তিনি সাহিত্যের পথে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সফলকাম হতে পেরেছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর রঙ্গরসিক শিব্রামীয় মুখোশের আড়ালে ট্রাজিক মুখের প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরার প্রয়াস চলুক না কেন, শিবরাম কোনোভাবেই তাতে সক্রিয় হয়ে ওঠেননি।

শিব্রামই যে তাঁর সাহিত্যিক আত্মপরিচয়, তা কখনও বিস্মৃত হতে দেননি। শুধু তাই নয়, আত্মজীবনীতেও সেকথা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। জনাব সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে শিবরাম অকপটে জানিয়েছেন : 'যারা নিজের দায় আর যুগের দায় একসঙ্গে মেটায়, সেই মহৎ স্রষ্টা মহারথীদের সগোত্র আমি নই। আমার কোনো দায় নেই— নিছক আদায়।' অন্যদিকে 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এ বিভূতিভূষণের শিল্পীসত্তার পরিচয় সম্পর্কে যা বলেছেন, তা তাঁর সম্পর্কে আরও নিবিড়ভাবে প্রকট হয়ে ওটে : 'শিল্পকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারাতেই যেমন যথার্থ শিল্প, তেমনি নিজের ব্যক্তিত্বের মহিমাকে লুকোতে পারলেই শিল্পীর সত্যিকার বাহাদুরি।' সেই 'বাহাদুর' শিল্পী স্বয়ং শিবরাম। তিনি নিজেকে বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের ধারায় শিব্রামের মুখোশ শুধু আত্মগোপন করেননি, সেইসঙ্গে সেই সাধনায় উদ্যোগী ভূমিকাও সৎসাহসে ব্যক্তি করেছেন।

'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর'-এর সমসাময়িক পরিসরে ১৯৭৪-এ শিবরাম তাঁর শিব্রামীয় রচনাবলিকে পাঁচ খণ্ডে সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন যা পরবর্তীতে 'পুনশ্চ' প্রকাশনা থেকে ১৯৯৯-এ পুনর্মুদ্রিত হয়। তার প্রথম খণ্ডে শিবরামের স্বহস্তে মুদ্রিত অভিব্যক্তিতেই তাঁর সচেতন সাহিত্যচর্চার পরিচয়টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে : 'সার্কাসের ক্লাউন যেমন। সব খেলাতেই ওস্তাদ, কিন্তু তার দক্ষতা হলো দক্ষযজ্ঞ ভাঙার। সব খেলাই জানে, সব খেলাই সে পারে, কিন্তু পারতে গিয়ে কোথায় যে কী হয়ে যায়, খেলাটা হাসিল হয় না ; হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তাঁর খেলা হাসিল হয়। কিন্তু আমি তো পেরেছি কি!' স্বীকারের ঔদার্যে যোগ্যতার উৎকর্ষই প্রতিপন্ন হয়। শিবরাম শুধু পারেননি নয়, সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছেন। অন্যদিকে তিনি আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন তাঁর আত্মপরিচয় নিয়ে। সাহিত্যে দ্বিজত্ব লাভে এজন্য তাঁকে ছদ্মনাম ধারণ করতে হয়নি। নিজের নামকেই বিকৃত করে স্বকৃত পথে শামিল হয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'য় প্রসঙ্গক্রমে শিবরাম জনাব সাহেবকে বলেছেন, 'সাহিত্য জগতে দ্বিত্ব লাভ না করলে দ্বিজত্বলাভ করা যায় না'। শিবরাম দ্বিজত্বলাভ করেছেন স্বনামেই শুধু নয়, তার শূদ্রায়ণের মাধ্যমেও। সেই দ্বিজত্বের বিষয়টি নিয়ে শিবরাম কতটা সচেতন ছিলেন, তা বোঝা যায় 'ভালোবাসা ঈশ্বর পৃথিবী'-র অন্তিম পর্বে। হকারবন্ধু মন্টুকে শিবরাম জানিয়েছেন ডাকনামে নামডাক হয় না। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত কোনো নামে পুনরায় বিখ্যাত হওয়া সম্ভব নয়। শিবরামের নিজের ক্ষেত্রেও তা স্বীকার করে নেন, 'সেইজন্যেই তো ফেমাস হতে পারলাম না।' সেই 'ফেমাস' হওয়ার জন্য রামকেষ্টও স্কুলের খাতায় নাম পালটে ফেলেছিল। ইতিমধ্যে তার মৃত্যু হয়। তার মাসদুয়েক পরে সেই স্কুলের ছাত্র বটুক এসেছিল কেষ্টরামের খোঁজে। সেই রামকেষ্টই যে কেষ্টরাম হয়েছে, তা অবশেষে শিবরাম জানতে পারেন। সেই সঙ্গে তিনিও পাঠককে জানিয়ে দেন রামকেষ্টের মৃত্যুশোকে বটুকের কালো মুখে সময়ান্তরে 'আলোর ঝিলিক' এসে পড়ে : 'যাই, হেডমাস্টার মশাইকে বলি গে, ইস্কুলের বেস্ট বয় ছিল সে— পড়াশোনা খেলাধুলায় সবদিকেই চৌকস। একদিন স্কুলের ছুটি পাওয়া যাবে নিশ্চয় তার জন্যে।... আর, আজও হাফ হলিডে।' তার অব্যবহিত পরিসরেই শিবরাম জানিয়ে দেন : 'বটুকের মুখ আবার টুকটুকে হয়ে ওঠে। এবং প্রায় লাফাতে লাফাতেই সে চলে যায়।' আসলে এভাবে তেতাল্লিশটি অধ্যায়ের শেষে শিবরামের তুলির শেষ আঁচড়েই তাঁর শিব্রামের ভাববিগ্রহটি স্বমূর্তি লাভ করে। সেখানে শোকের চেয়ে ছুটির বাস্তবতাই প্রকট। শিবরাম জানতেন পাঠক তাঁর মধ্যে শিব্রামকে খোঁজে, দেখে থাকে, পেতে চায় এবং সেটাই বাস্তব সত্য। তিনিও আপনা থেকে ছুটি নিয়েছিলেন। শোকের চেয়ে ছুটিটাই বাস্তব এবং আবেদনক্ষম। শিবরাম তাঁর আত্মজীবনীতে শিব্রামের জীবনী রচনার লক্ষ্যেই ব্রতী হয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি অর্জুনের সাফল্য পেয়েছেন। নিজের জীবনকেও সেই লক্ষ্যে শৈল্পিক সত্তায় সঁপে দিয়েছেন।

শিবরাম 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'য় বলেছেন, 'আমি চাই আমি হতে।' 'পান' সম্রাট শিব্রাম এসে হয়তো বলবেন 'আম'ই তো হয়েছি। কাঁচায় অম্লমধুর, পাকায় রসে টইটম্বুর। 'দেওয়ান-ই-আম' তথা আমজনতার দরবারে তো শিব্রামের অবাধ সমাদর। শিবরাম তাঁর আত্মজীবনীতেও শিব্রামের স্থায়ী আসন পাকা করে তুলেছেন। এরকম বিচিত্র প্রকৃতির আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্য তো বটেই, পৃথিবীর সাহিত্যেও বিরল মনে হয়।

(লেখক প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

‘গোটা দেশ উদ্বিগ্ন’— আরজি কর প্রসঙ্গে বললেন ডাঃ মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ আগস্ট কলকাতায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একজন তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। তারপরেই ওই হাসপাতাল এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতির পর্দাফাঁস হয়। স্বাস্থ্য দুর্নীতির অভিযোগে ওই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। ইডিও হানা দিয়েছে তার বাড়িতে। আরজি কর হাসপাতালের এই ঘটনা প্রসঙ্গে গত ৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। তবে মানুষকেও তিনি সচেতন হতে বার্তা দিয়েছেন। আরজি কর হাসপাতালে এই নারকীয়, পৈশাচিক ও মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর একমাস কেটে গিয়েছে। গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরব ও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। জুনিয়র ডাক্তার থেকে নাগরিক সমাজের সম্মিলিত এই আন্দোলনের আবহে শ্রীভাগবত বলেন— ‘ভারতীয় সংস্কৃতি চিরকাল মহিলাদের মাতৃশক্তি হিসেবে বন্দনা করেছে। যখন সীতাহরণ হয়েছে, তখন রামায়ণ হয়েছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হওয়ায় মহাভারত হয়েছে। সেই ভারতে কী করে এই ঘটনা ঘটে? নাগরিকদের অনেক বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন’। দু’দিনের সফরে গত ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এসেছিলেন ডাঃ মোহন ভাগবত। শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি। আর.জি. কর প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য— ‘যে বা যারাই দোষী হোক, তাদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে কঠোর সাজা দিতে হবে। গোটা দেশ এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন’। আর.জি. কর কাণ্ডে সুবিচার চেয়ে তিনি বলেন— ‘যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। দোষীদের শাস্তি দিতে সরকার যা পদক্ষেপ করবে, তাতে পূর্ণ সমর্থন থাকবে’।

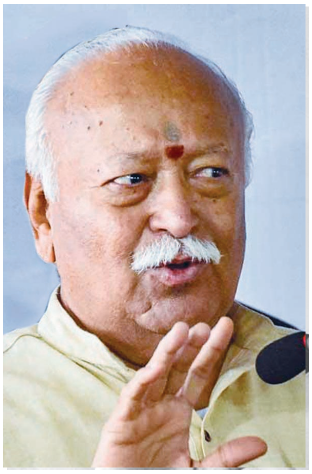

ঋগ্বেদে গ্রন্থিত ৬,০০০ বছরের প্রাচীন মহাজাগতিক বিস্ময়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় প্রকাশ যে বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে শুধুমাত্র ধর্ম ও দর্শনের কথা বলা নেই। ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত বিভিন্ন স্তোত্র ও শ্লোকের সংকলনের সঙ্গে এই গ্রন্থে রয়েছে সুপ্রাচীন কালের মহাজাগতিক ঘটনাবলীর রেকর্ডও। মানবজাতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সূর্যগ্রহণের তথ্যসূত্র রয়েছে এই গ্রন্থেই। পাশ্চাত্য চিন্তাধারাসম্পন্ন ভাষাবিদদের মতে ঋগ্বেদ সংকলিত হয়েছিল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রাথমিকভাবে এর আলোচ্য বিষয় আধ্যাত্মিক হলেও এই গ্রন্থে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীরও উল্লেখ রয়েছে। তার

মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা, এটি সংকলনের কয়েক শতাব্দী আগের। সেই রকমই একটি প্রাচীন সূর্যগ্রহণের ঘটনার কথাও নথিবদ্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে— এমনটাই দাবি মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মায়াঙ্ক ভাহিয়া এবং জাপানের ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরির মিৎসুরু সোমার। তাঁদের মতে, প্রায় ৬ হাজার বছর আগের এক সূর্যগ্রহণের কথা রয়েছে ঋগ্বেদে।

এই দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঋগ্বেদ পড়তে গিয়ে কয়েকটি বিশেষ অনুচ্ছেদ পেয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে— ‘‘সূর্যকে ‘বিদ্ধ’ করেছে অন্ধকার এবং এর ‘জাদুবিদ্যা’ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে’’। হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনিগুলিতে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণকে রাহু ও কেতুর গ্রাস হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিদেশি ভাষাবিদদের ধারণা অনুযায়ী, ঋগ্বেদ সংকলিত হয়েছিল পুরাণ রচনার (অর্থাৎ, রাহু ও কেতুর কাহিনি সৃষ্টির) অনেক আগে। কাজেই, ঋগ্বেদে এই যে সূর্যের অন্ধকারে বিদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা বহু আগের কোনো একটি সূর্যগ্রহণের ঘটনা বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এর থেকে স্পষ্ট যে সেই সময় সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সেই সময়ের ঋষিকুল ও আপামর জনসাধারণ।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩১

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা